প্রাডোমিক
সঞ্চারী ভট্টাচার্য্য

প্রাতিভাসিক

সঞ্চারী ভট্টাচার্য্য

প্রাতিভাসিক

Prativashik

প্রথম ইবুক প্রকাশ

জুলাই, ২০২১

গ্রন্থসত্ত্ব

সঞ্চারী ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদ

কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

বিন্যাস (ইবুক)

টিম সুইফটবুকস

প্রকাশক

রোশনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

'খোয়াই প্যালিশিং হাউস', বেহালা, কলকাতা - ৬০

বিঃ দ্রঃ — লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক, বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, বা পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতি চুমকি চ্যাটার্জী ; শ্রদ্ধেয় শ্রী ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ; শ্রী কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতি রোশনি বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রী তিমির বরণ ভট্টাচার্য ও শ্রীমতি সুতপা ভট্টাচার্যকে।
আপনাদের আশীর্বাদ ছিল বলেই আজ আমার পক্ষে এই জায়গায় পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে ।

লেখিকা পরিচিতি

সঞ্চারী ভট্টাচার্য্য, জন্ম ৩ জানুয়ারী, ১৯৯০ সালে কলকাতায়। কলকাতার মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা। ছোটবেলা থেকেই লিখতে ও পড়তে ভালোবাসেন। ইতিহাস বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেওয়ার পর লেখালিখির বিষয়টির প্রতি আরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নিজস্ব ফেসবুক গ্রুপে লেখালিখির করে জনপ্রিয়তা অর্জনের পর সাহিত্যের এক নতুন দিক আবিষ্কার করেন তিনি। ভৌতিক গল্পের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জনের পরে ভূততত্ত্ব ম্যাগাজিনে প্রথম লেখার সুযোগ পান ২০১৯ সালে। এরপর নিজস্ব ভৌতিক উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ২০২০ সালের কলকাতা বইমেলায় "মেহেরুন্নিসা"। খোয়াই পাবলিসিং হাউস থেকে এই সমাদরটি অর্জনের পরেও থেমে থাকেননি তিনি। সাঁঝবাতি, সূচনা, শিল্পনীড় সাংস্কৃতিক পত্রিকা, প্রগতি পত্রিকা, বৃত্তের বাইরে, হিয়ার কথা, বইবাড়ি (বাংলাদেশ), চন্দ্রপ্রভা (বাংলাদেশ), কান্ডারি, রোদের ডানা, বুক রিডার্স পাবলিকেশন, স্টোরি মিরর, প্রভৃতি জনপ্রিয় পত্র পত্রিকাতেও লেখালিখি করেছেন এবং বর্তমানেও করে চলেছেন নিয়মিতভাবে। অনুরাগীদের ভালোবাসা এবং সমর্থনকেই পাথেয় করে চলতে চান তিনি । ২০২১ সালে বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড থেকে কর্ণিকার ল্যাপটপ প্রকাশিত হয়েছে। এটিও একটি ভৌতিক উপন্যাস। প্রতিলিপি অ্যাপেও তিনি একজন টপ রেটেড লেখিকা। প্রতিলিপিতে তার পাঠকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি।

ভূমিকা

প্রকৃতির সাথে খেলার অধিকার আমাদের কারুর নেই, না আছে তার অন্তর্নিহিত অর্থ খোঁজার অধিকার। তবুও প্রকৃতি যদি কখনও আমাদের বাধ্য করে তখন কিছু জিনিস বোঝা খুব কঠিন হয়ে যায়। প্রতিভাসিক শব্দের অর্থ যা অদৃশ্য হয়েও দৃশ্যমান। অর্থাৎ দেখা না যাওয়ার পরেও যার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে ভৌতিক ও অলৌকিক বিষয় নিয়ে চর্চা আদিমকাল থেকেই বহমান ছিল। তবে ভয়ের যে হাজারো রূপ হতে পারে তার প্রমাণ আমরা বিভিন্ন চিত্রপটে পেয়েছি। সময় এবং অনুভূতির পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের অনুভবেরও পরিবর্তন ঘটেছে। ভয় আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে নানান মাত্রায়, নানানভাবে। প্রতিভাসিকে বর্ণিত হয়েছে তেমনই একটি আবর্ত, যা না থেকেও প্রতিটা মুহূর্তে আপনাকে নিজের উপস্থিতির কথা টের পাওয়াবে। সময়ের থেকে যে মানুষের জেতা সম্ভব নয়, সেটির প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেবে। সময়কেই সময়ের কাজ করতে দেওয়া উচিৎ, আমরা তো কেবল দর্শক মাত্র, এই ধারণার বাস্তবিক মূল্যায়নের নামই প্রতিভাসিক। নীলাদ্রীবাবু তার আট বছরের মেয়ে মৈথিলীকে পেটে ব্যাথার জন্য ডাক্তার দেখাতে গিয়ে এক অকল্পনীয় সত্যি জানতে পারেন। তাঁর মেয়ে নাকি গর্ভবতী যেখানে সে এখনও বয়ঃসন্ধিকালেও পৌঁছায়নি। তিনি লক্ষ্য করেন কিছু ছায়ামূর্তি সর্বক্ষণ তাদের বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা হারা এই মেয়েটির গর্ভে কার ভ্রুন বাসা বাঁধতে পারে? সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাওয়া একটি ঘটনা যেখানে মেডিকেল সায়েন্সও হার মানতে বাধ্য হয়েছিল। কী অপেক্ষা করছে তাদের জন্য? আশা করি ভয়ের সাথে এই হৃদয়ী মেলবন্ধনে আপনাদের সকলকেই পাশে পাব। জানুন এক চমকপ্রদ ভয়ের ইতিবৃত্তকে, অন্তঃকরণ করুন। আর কী সেই ভয়,জানতে হলে অবশ্যই পড়ুন সঞ্চারী ভট্টাচার্যের হাড়হিম করা গল্প প্রাতিভাসিক।

সঞ্চারী ভট্টাচার্য্য
জুন, ২০২১

এক

"আপনার মেয়ে প্রেগনেন্ট।" ডক্টর অখিল দাশগুপ্তের চোখটা তখনও স্থির হয়ে রয়েছে মনিটরের স্ক্রিনের দিকে।

কেবিন তখন নিস্তব্ধ। পাশের সরু খাটটায় শায়িত আট বছরের মৈথিলী। অখিল দাশগুপ্তের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অখিলবাবুর পাশেই একটি চেয়ারে বসে রয়েছেন নীলাদ্রি মুখার্জী, মৈথিলীর বাবা। ডাক্তারি শাস্ত্রকে হার মানিয়ে এ কোন পৈশাচিক খেলায় মেতে উঠেছে তার জীবন! উত্তর খোঁজার জন্য তাঁর নিরঙ্কুশ দৃষ্টি সামনে রাখা মনিটরটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করে চলেছে। আবারো সেই নিরাশা। উত্তর যখন প্রশ্নচিহ্নের আকার ধারণ করে, তখন পুঁথি পড়া জ্ঞান হার মানতে বাধ্য হয়।

"Impossible! অসম্ভব! আপনি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন তো?" নীলাদ্রিবাবু তির্যক ভাবে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলেন অখিলবাবুর দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ মনিটরে চোখ বুলিয়ে, সমস্ত পুঁথিগত জ্ঞানকে ঝালিয়ে নেওয়ার পরেও, অভিজ্ঞ অখিলবাবুর উত্তর সেই একই থাকে।

"মেডিক্যাল সায়েন্সে এমন ঘটনা এর আগে কখনো আমার চোখে পড়েনি। একটি আট বছরের মেয়ের পেটে ছয় মাসের বাচ্চা কীভাবে থাকতে পারে? মানব শরীরে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে এ কথা সত্যি। যার ব্যাখ্যা মেডিক্যাল সায়েন্সের হাতের মুঠোয় থাকে। কিন্তু মৈথিলীর কেসটা সম্পূর্ণ আলাদা — beyond science।"

কথাটি শেষ করে অখিলবাবু মৈথিলীর দিকে তাকালেন।

নীলাদ্রিবাবু মৈথিলীর সামনে ডাক্তারকে আর কোনো প্রশ্ন করতে চাইলেন না। আট বছরের একটি মেয়ের মনে এসব বিষয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হোক তা তিনি চান না। মৈথিলীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। ডাক্তারি শাস্ত্রের কাছে হেরে গেলেও নিজের মনের কাছে এত সহজে পরাজয় বরণ করার মানুষ তিনি ছিলেন না।

অখিলবাবুর চেম্বারে শেষবারের মতো পা রাখলেন তিনি। যাবার আগে মৈথিলীকে চুপ করে বাইরে দাঁড়াতে বলে গেলেন।

"আপনি মস্ত বড় ডাক্তার হলেও একটি সাধারণ ব্যাপারকে অসাধারণ প্রতিপন্ন করলেন। মানুষ তার মনের ভয় কমাতেই ডাক্তারি শাস্ত্রের সান্নিধ্যে আসে। আপনার মতামতই শেষ নয় জানবেন। পৃথিবীতে আরো অজস্র ডাক্তার রয়েছে। দরকার পড়লে আমি মৈথিলীকে নিয়ে বিদেশেও যাব। তবুও এর শেষ দেখেই ছাড়ব।" কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন নীলাদ্রিবাবু।

নীলাদ্রীবাবুর কোনো কথাই ডক্টর অখিলের কানে ঢোকেনি। তার চোখ তখনও আটকে রয়েছে মৈথিলীর মেডিক্যাল রিপোর্টে। বুকের ভেতর তোলপাড় হয়ে গেলেও, তিনি সেদিন মুখ খোলেননি।

কারণ তিনিও জানতেন রিপোর্ট কোনোদিন মিথ্যা হতে পারে না। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আর যুক্তি কোনোদিন মানুষের মর্জির ভিত্তিতে চলে না। কথার আন্দোলন মনের মধ্যে চললেও সেদিন মুখে বর্ণনা করার সুযোগ তিনি পাননি। তার আগেই নীলাদ্রিবাবু চেম্বারের দরজাটি তাঁর মুখের উপরে বন্ধ করে চলে গেলেন।

দুই

চেম্বারের বাইরে পা রেখেই চমকে উঠলেন নীলাদ্রিবাবু। মৈথিলী মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। পাশে একজন নার্স এসে দাঁড়িয়েছেন। অনেকবার মুখে জল দেওয়া সত্ত্বেও যখন মৈথিলীর জ্ঞান ফিরল না তখন তিনি অবাক চোখে নীলাদ্রিবাবুর দিকে তাকালেন। আর সময় নষ্ট না করে নীলাদ্রিবাবু মৈথিলীকে কোলে নিয়ে প্রায় একপ্রকার দৌড়েই হাসপাতালের সীমা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। অখিলবাবুর হাত-পা বাঁধা। রুগীর উপর একজন ডাক্তার অপেক্ষা তার পরিবারের মানুষজনেরই অধিকার বেশি থাকে। তাই নীলাদ্রিবাবুর এমন উদ্ভট আচরণ দেখেও তিনি মুখ বন্ধ করেই রইলেন।

"এই তো মা আমি তোর কাছেই আছি। একবারটি চোখ খোল মা। তোর কিছু হতে দেব না আমি। একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ না মা। তুই এভাবে আমায় ছেড়ে যেতে পারিস না।"

মৈথিলীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকলেন নীলাদ্রিবাবু।

কিছুক্ষণ পরেই মৈথিলীর জ্ঞান ফিরে এল। অবাক চোখে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "কী হয়েছে বাবা? আমি একদম ঠিক আছি। তুমি কাঁদছ কেন?"

আট বছরের শিশুর মুখে হাসি দেখে একজন বাবা যেভাবে নিশ্চিন্ত হন, নীলাদ্রিবাবুও সেদিন ঠিক একইভাবে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন। মৈথিলীকে গাড়িতে বসিয়েই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তিনি। বাড়ির দূরত্ব প্রায় পনেরো কিলোমিটার। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। অন্ধকারকে মৈথিলী আবার প্রচণ্ড ভয় পায়। তাই আলো থাকতে থাকতেই বাড়ি পৌঁছনোটা খুব জরুরি

রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটছে। গাড়ির গতির কাছে হার মেনেছে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা। এত দ্রুততার সাথে হয়তো নীলাদ্রিবাবুকে এর আগে কোনোদিন গাড়ি ছোটাতে হয়নি। আসন্ন বিপদ যে বড় ভয়ঙ্কর! একবার মৈথিলীর মনে অন্ধকারের সেই ভয় জেগে উঠলে তাকে আর কোনোভাবেই সামলানো যাবে না।

"বাবা এত জোরে কেন গাড়িটা চালাচ্ছ? আমার যে খুব ভয় করছে!" মৈথিলীর চোখেমুখে তখন তীব্র ভয় কাজ করছিল।

"তুমি চোখটা বন্ধ করে রাখো মা। কোনো ভয় নেই। আমি তোমার কিছু হতে দেব না, কথা দিলাম। তুমি একদম ভয় পাবে না। এইতো আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাব।" গাড়ির গতিবেগ স্থির রেখেই কথাগুলি বললেন নীলাদ্রিবাবু।

কোনোরকমে গাড়িটি ধাক্কা খেতে খেতে বাঁচল। স্টিয়ারিংয়ের উপর থেকে মাথাটা সরিয়ে দেখলেন বেশ অনেকটাই ক্ষত হয়েছে। ডান গালের পাশ ঘেঁষে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। হাতের আঙুলটা হর্নের

উপরে। হর্নের শব্দটা তখনও কানে এসে বিঁধছে। হুঁশ আসতেই নীলাদ্রিবাবুর মনে এল রাস্তায় হঠাৎ কালো রঙের একটি ছায়াকে পাশ কাটিয়ে গাড়িটি ঘোরাতে গিয়েই এই বিপত্তি হয়েছিল।

"মৈথিলী কোথায়? মা কোথায় তুমি?"

পাশে চোখ যেতেই তিনি দেখলেন মৈথিলী অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে পাশের সিটেই। সিটবেল্টটা তখনো শক্ত করে বাঁধা তার বুকের সাথে। যেখানে ছিটকে বেরিয়ে যাবার কথা সেখানে দিব্যি সিটের সাথে আটকে রয়েছে ছোট্ট মৈথিলী। গায়ের কোনো অংশেই কোনো ক্ষতের চিহ্ন মাত্র নেই, যেখানে অনেকখানি ক্ষতি হয়ে যাবার কথা। মৈথিলীকে বেশ কিছুক্ষণ হা করে দেখলেন নীলাদ্রিবাবু। মৃত্যুমুখ থেকে কীভাবে ফিরে এলেন তারা? আজকে তো তাঁদের মৃত্যু নিশ্চিত ছিল!

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন অ্যাক্সিডেন্টটি হয়েছে বাড়ি থেকে সামান্যতম দূরত্বে। অ্যাক্সিডেন্ট স্পট থেকে বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি হলে হয়তো দু'কিলোমিটারের মতো হবে। জায়গাটি নীলাদ্রিবাবুর সুপরিচিত। গাড়ির অবস্থা দেখে তার মনে হল এর চেয়ে পায়ে হেঁটে বাড়িতে আগে পৌঁছানো সম্ভব। মৈথিলীকে কোনোরকমে কোলে তুলে তিনি বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। মৈথিলী তখনো অচেতন। নীলাদ্রিবাবুর অনেক জায়গাতেই কেটেছড়ে গেছে কিন্তু তাঁর ধ্যান-জ্ঞান এখন শুধু মৈথিলী। তিনি কোনোরকমে মৈথিলীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছলেন। বাড়িতে আসতেই মালতি দরজা খুলে দিল। মালতিকে বাড়ির ফাইফরমাসের দায়িত্বে রেখেছেন নীলাদ্রিবাবু বেশ কিছুদিন হল। বিগত একমাস ধরে সে শুধু দিনের বেলাটাই বাড়ির আর মৈথিলীর যত্ন নিচ্ছে। রাতের বেলা বাড়িতে কাউকেই অনুপ্রবেশের অধিকার দেননা নীলাদ্রিবাবু। বিশেষ করে কোনো মেয়েকে। কারণ কোথাও না কোথাও তাঁর মনে হয়, মৈথিলীর অসুস্থতা এতে আরো বৃদ্ধি পায়। কোনো মেয়েকে চোখের সামনে দেখলেই সে বড় অদ্ভুততভাবে আচরণ করতে থাকে। অনেকসময় অচেতন হয়ে পড়ে, হাত-পা বেঁকে যায়। এরকম বহু আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী থাকার পরে এই পদক্ষেপ।

তিন

মৈথিলীকে কোলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুয়ে দিল মালতি।

"দাদাবাবু বিটিয়ার গায়ে তো খুব জ্বর। আপনি যখন বিটিয়াকে নিয়ে গেলেন তখন তো সে একেবারেই সুস্থ ছিল। তাহলে হঠাৎ এমনটা ঘটল কীভাবে?" নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে প্রশ্ন করল মালতি।

নীলাদ্রি সেই সময় কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন। বাইরের কোনো মানুষের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত জীবনের আলাপচারিতায় তিনি ইচ্ছুক নন।

মালতির প্রশ্নের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে তিনি বললেন, "রাতের খাবারটা কি বানানো হয়ে গেছে?"

মালতি বুঝল দাদাবাবু তার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলেন বা জবাব দিতে ইচ্ছুক নন। তাই আর কথা না বাড়িয়ে মালতি বলল, "হ্যাঁ দাদাবাবু, রাতের খাবার আমি অনেক আগেই বানিয়ে রেখেছি। আপনি খাওয়ার আগে মাইক্রোওভেনে একটু গরম করে নেবেন। আমি তাহলে এখন আসি?"

"ঠিক আছে, এসো। যাওয়ার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেও। যদিও আমার আজকে খাওয়ার ইচ্ছে নেই। মৈথিলীর জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত আমি দু'-চোখের পাতা এক করতে পারব না।"

মালতি চলে যাওয়ার সময় ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

নীলাদ্রিবাবু বসলেন মেয়ের মাথার কাছে। হঠাৎ বাইরে বৃষ্টি শুরু হল। বিদ্যুতের ঝলকানিতে চোখটা গিয়ে পড়ল সামনের দেওয়ালের দিকে। দমকা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। জানলার কপাটটা দেওয়ালের সাথে লেগে বারে বারে আওয়াজ করতে লাগল। নীলাদ্রিবাবু উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন ছবিটির দিকে। ছবিটি তার মৃত স্ত্রী অনিন্দিতার। আজ তিন বছর হল তিনি গত হয়েছেন।

ছবিটিকে হাতে নিয়ে দেখতে যাবেন, এমন সময় ছবিটি মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বিক্ষিপ্তভাবে কাঁচগুলো এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কাঁচগুলোকে হাত দিয়ে সরিয়ে ছবিটি তুলতে যাবেন এমন সময় বিকট চিৎকার করে কেঁদে উঠল মৈথিলী। নীলাদ্রিবাবু নজরটা ঘোরালেন। মৈথিলীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিন্তু সে চোখ বন্ধ করে বিকট সুরে চিৎকার করে চলেছে। মনে হচ্ছে সে তার পরিচিত মেয়ে নয়। যেন কোনো মানুষের উপরে স্বয়ং শয়তান ভর করেছে।

নীলাদ্রিবাবু ছবিটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে দৌড়ে গেলেন মৈথিলীর দিকে। কোনোরকমে তাকে চুপ করালেন। বাইরে তখনও ঝড়ের দাপট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মৈথিলী আবার বিছানায় নেতিয়ে পড়ল। নীলাদ্রিবাবু বুঝলেন ছোট্ট মেয়ের কষ্টের কথা। এত কষ্ট নিয়েও যে সে এতদিন ধরে যুঝছে, সেটাই সবথেকে বড় ব্যাপার। তবে নিজের স্ত্রীর আকস্মিক ও ভয়ঙ্কর মৃত্যুটি তাকে আজও তাড়া করে বেড়ায়।

নীলাদ্রিবাবুও সেদিন খুবই ক্লান্ত ছিলেন। কখন যে চোখ লেগে এসেছিল খেয়াল নেই। যখন ঘুম ভাঙল তখন কাক ডাকছে। কর্কশ গলার আওয়াজে তার কাঁচা ঘুমটা হঠাৎই ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখলেন মৈথিলীর এক পাশেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছে। ভালো ঘুম হয়নি রাতে। আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙল। ঘড়ির দিকে চোখ যেতেই তড়াক করে উঠে বসলেন। ন'টা বাজে। হাতে মোটে আর একটা ঘন্টা। তার মধ্যেই রেডি হয়ে অফিসের জন্য রওনা হতে হবে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকদিন অফিস কামাই করতে বাধ্য হয়েছেন। মনে মনে ভাবলেন, মালতি এখনো আসছে না কেন? এতক্ষনে তো তার এসে পড়ার কথা!

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। ভাবলেন এই বুঝি মালতি এসে পড়েছে। তাড়াহুড়ো করে দরজাটা খুলেই একপ্রকার অপ্রকৃতিস্থ বোধ করলেন তিনি। একটি পানসে মুখ, সাদা পাঞ্জাবী আর ধুতি পড়ে দাঁড়িয়ে তার সামনে। নীলাদ্রিবাবু তাকে কোনোদিন এর আগে দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। লোকটির চুল উস্কোখুস্কো। জামা, জুতো সবই নোংরা।

"আপনি কে? আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না তো?" কৌতূহলের সাথে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলেন আগন্তুকের দিকে।

আগন্তুকটি কিছু বলার আগেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "আমি মালতির স্বামী। গতকাল আপনার বাড়ি থেকে ফেরার পরে সেই যে দরজা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেছিল, আর খোলেনি। হাজারবার ডাকার পরেও দরজা খোলানো যায়নি। আজকে যখন দরজা ভেঙে ঢুকলাম, তখন দেখলাম সিলিংয়ের সাথে তার দেহটা ঝুলছে। জিভ বেরিয়ে রয়েছে। চোখগুলো যেন গিলে খেতে আসছে। তাড়াহুড়ো করে নামাতে গেলাম। শরীর একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে। বুঝলাম সব শেষ। মালতি আর নেই দাদাবাবু। সেই খবরটাই দিতে এসেছিলাম।" কথাটি শেষ করেই লোকটি চোখের জল মুছতে মুছতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

মালতির কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকে দেখেন মৈথিলী তখনো ঘুমোচ্ছে। মালতির কথাটি কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছেন না। নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া সেই ভয়াল অভিজ্ঞতার কথা আবার একবার তার হৃদয়টাকে মোচড় দিয়ে গেল। আবার সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতিগুলি একের পর এক চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল নীলাদ্রিবাবুর। দরজাটা কোনোরকমে বন্ধ করে মৈথিলীর পাশে গিয়ে বসলেন তিনি।

"কেন এমনটা বারে বারে হচ্ছে ঈশ্বর? কী আছে এর পেছনে? কে করাতে চাইছে এইসব? কী বা তার উদ্দেশ্য?" অবর্ণনীয়ভাবে ব্যক্ত করতে লাগলেন নিজের মনের কথাগুলিকে। যদিও নীলাদ্রিবাবু খুব ভালোভাবেই জানেন এই রহস্য ভেদ তার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। তবুও করজোড়ে তিনি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করেন যেন এই রহস্যের সমাধান তিনি বার করতে পারেন।

"তোমার কী হয়েছে বাবা?" মৈথিলীর গলায় নরম সুর শুনে চোখের জলটা মুছে নিলেন নীলাদ্রিবাবু।

“কিছু হয়নি মা।” বলেই বুকে টেনে নিলেন ছোট্ট মৈথিলীকে।

চার

"বাবা, আমার পেটে কেমন যেন একটা ব্যথা করছে। আমি বুঝতে পারছি না এমনটা কেন বারবার হচ্ছে আমার সাথে।" বেদনার স্বরেই কথাটা নীলাদ্রিবাবুকে বলে উঠল মৈথিলী।

নীলাদ্রিবাবুর কাছে নিজের মেয়ের জীবনের থেকে আর কোনো কিছুই বেশি দামী নয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মৈথিলীকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটলেন। তবে এবার আর অখিল দাশগুপ্তের কাছে নয়, অন্য কোনো ডাক্তারকেই মৈথিলীকে দেখাবেন এমনটাই মনস্থির করলেন।

ডক্টর রূপক হালদার, মস্ত বড় ডাক্তার। নামের পাশে অনেক ডিগ্রী। মৈথিলীকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখেই তিনি ওর পরীক্ষা করা শুরু করলেন।

আলট্রাসোনোগ্রাফির রিপোর্টে সেই একই ইঙ্গিত প্রকাশ পেল। একটি আট বছরের বাচ্চা মেয়ে ছয় মাস ধরে প্রেগনেন্ট, অথচ সেই লক্ষণ তার শরীরের বাইরে কোথাও প্রকাশ পায়নি। কিন্তু এই অবস্থায় যে কোনো নারীরই শারীরিক লক্ষণ দেখে স্পষ্ট বুঝে যাওয়ার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা।

মৈথিলীকে দেখে একটু হাসলেন রূপকবাবু। অবশ্যই সেটা মৈথিলীর সন্দেহ এড়ানোর জন্য। কারণ এরকম একটা কথা শুনলে যে কোনো মানুষই অবাক হবেন। শুধু অবাক বললে ভুল হবে সারা জীবনের জন্য মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলতে পারেন।

তিনি একজন নার্সকে ডেকে মৈথিলীকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন। মৈথিলী বাবাকে ছেড়ে যেতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিল, তবুও তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নীলাদ্রিবাবু অন্য ঘরে রেখে আসতে সক্ষম হলেন।

রূপকবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "মৈথিলীর সাথে কবে থেকে এরকম হচ্ছে?"

"আপনি ঠিক কী এবং কেন জানতে চাইছেন সেটা পরিষ্কার করে কি আমাকে বলবেন?"

"আপনার মেয়ে ছয় মাসের একটি বাচ্চাকে বহন করছে। যে সব অস্থিরতা সে অনুভব করছে সেগুলির পিছনে এই কারণটিই রয়েছে। অথচ আপনার মেয়ের শরীরে মা হবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায়নি। এমনকী পরীক্ষা করা ব্যতীত এমনটা বোঝাও কঠিন। আপনি কি এতদিন ধরে এই বিষয়টা সম্পর্কে জানতেন না?"

"আবারও সেই এক কথা। সকলের কি এই কথাটা ছাড়া আর কোনো কথা নেই? আমার মেয়ে গর্ভবতী নয়। আমি ওর বাবা। ওর সাথে সব সময় থেকেছি। চোখের সামনে সে বড় হয়েছে। আর তাছাড়া আমার মেয়ের এখনও বয়ঃসন্ধিরও সময় হয়নি। কাজেই এমন লক্ষণ দেখতে পাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর সেখানে আপনারা প্রত্যেকে একই কথা বলে বলে সমানে আমাকে বিব্রত করে চলেছেন। কেন? আপনাদের কি আমাকে পাগল বলে মনে হয়?"

একপ্রকার উচ্চস্বরে কথাগুলি বললেন নীলাদ্রিবাবু।

ডাক্তার নিজেও হতবাক। এমন কেস তিনিও এর আগে কোনোদিন দেখেননি। তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। সন্তান ধারণের ক্ষমতার জন্য মেয়েদের একটা নির্দিষ্ট বয়স রয়েছে। সেটা কমপক্ষে বারো বছরের ঊর্ধ্বে। তিনি কথা না বাড়িয়ে ভাবলেন তার সিনিয়র ডাক্তারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করবেন। তিনি নীলাদ্রিবাবুকে বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে মৈথিলীকে নিয়ে বাড়ি যান। আমি আপনার সাথে সত্ত্বর যোগাযোগ করব। আশা করি এর একটা উপায় ঠিকই বার করা সম্ভব হবে। মেডিক্যাল সায়েন্স এখন অনেক উন্নত।"

নীলাদ্রিবাবু একপ্রকার রেগেমেগে অস্থির হয়েই মৈথিলীর কাছে গেলেন। গিয়ে তিনি যা দেখলেন তা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। দেখলেন নার্সটি মৈথিলীর পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে গোঙাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে গাঁজা উঠছে। মৈথিলী সেই মহিলার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। তার চোখদুটো একেবারে রক্তবর্ণা। মৈথিলীর এমন ভয়ঙ্কর রূপ এর আগে কোনোদিনও তার চোখে পড়েনি। তিনি মৈথিলীর নাম ধরে ডাকতেই সে তাকাল তার দিকে।

এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল মৈথিলীর গলা দিয়ে, যেন কোনো মেয়ের শরীরের মধ্যে থেকে কোনো পুরুষের আর্ত চিৎকার শোনা গেল।

"একে আমার চোখের সামনে থেকে দূরে নিয়ে যা এক্ষুনি, নাহলে একে আমি শেষ করে ফেলব।" তারপরেই এক আর্ত চিৎকার আকাশ বাতাস মুখরিত করে ধ্বনিত হতে লাগল। গোটা করিডোরটি কেঁপে উঠল সেই চিৎকারে। নীলাদ্রিবাবু তখন ছোট্ট মৈথিলীর দিকে তাকিয়ে কাঁপছেন।

ততক্ষণে ডক্টর রূপকও এসে পৌঁছেছেন সেই স্থানে। মৈথিলীকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কেবিনে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন। দুজন নার্স এগিয়ে গেল তার দিকে। মৈথিলীর গায়ে তখন আসুরিক শক্তি, তার সঙ্গে বাহুবলে পেরে ওঠা খুবই মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। তথাপি কোনোরকমে তারা হাত লাগিয়ে মৈথিলীকে একটি বেডে শুইয়ে হাত পা বেঁধে দিলেন শক্ত করে। মৈথিলী তখনও গজরাচ্ছে। নীলাদ্রিবাবু চোখের সামনে এমন নৃশংসতা সহ্য করতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে আসলেন। ওঁর পিছন পিছন রূপকবাবুও বেরিয়ে এলেন।

"আমি বুঝতে পারছি নীলাদ্রিবাবু আপনার অবস্থা। তবে মৈথিলীকে আমি টানা আটচল্লিশ ঘণ্টা অবসারভেশনে না রাখলে বুঝতে পারব না ওর সাথে অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছে? আপনি দয়া করে বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আটচল্লিশ ঘণ্টা না কাটলে আমার পক্ষে কোনোপ্রকার সিদ্ধান্তে আসাই সম্ভব নয়।" বললেন রূপকবাবু।

"আমি আমার মেয়ের কাছ থেকে কোথাও যাব না। আমাকে এখানে ওর সাথেই থাকতে দিতে হবে।" জোর দিয়ে বললেন নীলাদ্রিবাবু।

"বেশ তো, আপনার কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। এই হাসপাতালের রেস্ট রুমেই আমি আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দেব। আপনি আপনার মেয়ের কাছেই থাকতে পারবেন। তবে একটাই অনুরোধ, একা একা আপনি আপনার মেয়ের সাথে এই দু'দিন দেখা করতে পারবেন না। কারণ ওকে

মেডিক্যাল অবসারভেশনে রাখা হবে। কাজেই আমরা বাদে অন্য কেউ ওর ঘরে যেতে পারবে না। আপনাকে নিজের আবেগকে কিছুটা সংযত করে রাখতেই হবে। আসুন আমার সাথে।" ডক্টর রূপক নীলাদ্রিবাবুকে খুব কাছের মানুষের সুরেই কথাগুলো বললেন।

প্রথম দিকটায় বিশ্বাস করতে না পারলেও রূপকবাবুর কথাগুলি তার মনে দাগ কেটে গেল। নিজের মেয়েকে সুস্থ করবার অভিপ্রায় তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে আজ প্রায় ছয় মাস ধরে। এবার এর একটা বিহিত হোক এমনটাতেই তিনি আশাবাদী। তাই কথা না বাড়িয়ে তিনি রূপকবাবুর কথাতেই সম্মতি দিলেন। যাওয়ার আগে একবার মৈথিলীর মুখটা কেবিনের বাইরে থেকে দেখলেন। একেবারে শান্ত পরীর মতো ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট মেয়েটি। যেন কত শান্তি বিরাজ করছে ওর মুখেতে। চোখের জলটা বাঁ হাত দিয়ে মুছে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

পাঁচ

ডক্টর রূপক হালদার চেম্বার থেকে বেরিয়ে সরাসরি দেখা করতে চলে গেলেন ডক্টর কাপাসের সঙ্গে। কাপাস এতদিন ইংল্যান্ডে কর্মরত ছিলেন। এমনিতেই তিনি কলকাতায় খুব কমই আসেন। এখন, যখন তিনি এখানে রয়েছেন তখন রূপক বাবু ভাবলেন তার সঙ্গেই কেসটি আলোচনা করে নেওয়া উচিৎ। যদি কোনোরকমে কোনো উপায় বেরিয়ে আসে।

কাপাসের চেম্বারে পৌঁছলেন তিনি। মৈথিলীর রিপোর্টটা তার হাতে। তখন ডক্টর কাপাস রুগী দেখতে ব্যস্ত। ওঁকে দেখে তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে কিছুটা সময় চেয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ বাদে ডক্টর রূপক প্রবেশ করলেন ওঁর চেম্বারে।

"আরে রূপক যে! বসো বসো। তুমি আমার সাথে দেখা করতে এসেছ কী মনে করে! নিশ্চয়ই কোনো কেসের জটিলতা নিয়েই তুমি দুশ্চিন্তায় পড়েছ? কি ঠিক বলছি তো?" কাপাস মৃদু হাসলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন স্যার। একটা অদ্ভুত কেস এসেছে স্যার। আমার বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে এর কোনো ব্যাখ্যা পাইনি। এই কারণেই ছুটে আসতে হল। তবে আপনার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যও এটার সাথে জড়িত রয়েছে বৈকি।"

একটু অন্যমনস্ক হয়েই উত্তর দিলেন ডক্টর রূপক হালদার।

"তা বেশ তো। এসেই যখন পড়েছ তখন না হয় বলেই ফেলো, দেখি তোমাকে সাহায্য করতে পারি কিনা?"

"আমার কাছে আজকে সকালে মৈথিলী নামে একটি মেয়ের কেস এসেছে। কেসটি এতটাই জটিল যে আমার দশ বছরের অভিজ্ঞতাও এর কাছে একপ্রকার হার মেনেছে। আমি খুবই চিন্তিত। মেয়েটির বাবা একটি সরকারি অফিসে কাজ করেন। ওঁকে আমি কোনোরকমে সান্ত্বনা দিয়ে হাসপাতালে বসিয়ে রেখে এসেছি। আর ওঁর আট বছরের মেয়েটিকে আটচল্লিশ ঘণ্টা অবসারভেশনে রাখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই যে মেয়েটির আলট্রাসোনোগ্রাফির রিপোর্ট। আপনাকে দেখাবার জন্য নিয়ে এসেছি।" রিপোর্টটি কাপাসের হাতে তুলে দিলেন তিনি।

"কেন, কী এমন অবাস্তব ঘটনা ঘটেছে একটা বাচ্চা মেয়ের সাথে, যার জবাব মেডিক্যাল সায়েন্সের কাছে নেই?" কথাটি একটু ব্যঙ্গের সুরেই বললেন ডক্টর কাপাস।

ডক্টর কাপাস সম্পূর্ণ রিপোর্টটা খুব ভালো ভাবে পড়ে দেখলেন। একবার নয়, ভালোভাবে বোঝার জন্য তিনি প্রায় দু' থেকে তিনবার পড়লেন। কিন্তু শেষমেশ নিজেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এমনটাও কি কোনোদিন হওয়া সম্ভব? রিপোর্টে মৈথিলীর গর্ভে স্পষ্ট একটা ভ্রূণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাধারণত মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বয়স কুড়ি থেকে চব্বিশ সপ্তাহ হলে ভ্রূণের এমন আকৃতি হয়ে থাকে।

কাপাস বিস্ময়ভরা কণ্ঠে ডক্টর রূপককে বললেন, "ও মাই গড! একটা আট বছরের বাচ্চা মেয়ের গর্ভে এত বড় একটা ভ্রূণের অস্তিত্ব কী করে থাকতে পারে?"

"আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। ডাক্তারি শাস্ত্রে এমনটা এর আগে কোনোদিন ঘটতে দেখা গেছে কিনা আমার সত্যিই জানা নেই।" জবাবে বললেন রূপকবাবু।

"আচ্ছা এটা তো টিউমারও হতে পারে।" বললেন ডক্টর কাপাস।

"এত বড় একটা টিউমার পেটে থাকলে শরীরের বাইরে তা অতি অবশ্যই জানান দিত। কিন্তু তেমন কোনো কিছুই দেখতে পাওয়া যায়নি রিপোর্টে।" পাল্টা উত্তর দিলেন রূপকবাবু।

"আপনার কাছ থেকে যতটুকু শুনলাম তাতে মনে হল বাইরে থেকে দেখলে মেয়েটিকে যথেষ্ট স্বাভাবিক লাগে। কিন্তু আপনি হঠাৎ এতকিছু বাদ দিয়ে মেয়েটির পেট চেক আপ করতে গেলেন কেন? আমি আসলে বলতে চাইছি, আপনার এরকম কেন মনে হল যে মৈথিলীর পেটেই কোনো সমস্যা থাকতে পারে?"

একটু গম্ভীরভাবে জানতে চাইলেন ডক্টর কাপাস।

"আসলে আমি মেয়েটিকে যখন চেক আপ করছিলাম সেই সময় হঠাৎ সে চিৎকার করে ওঠে। আমার হাতটা ওর পেটের কাছে নিয়ে যেতেই ও কেমন যেন অস্থির বোধ করতে থাকে। মেয়েটা প্রচণ্ড জ্বর গায়ে নিয়ে এসেছিল আমার চেম্বারে। ওর বাবা অর্থাৎ নীলাদ্রিবাবুর কাছ থেকে আমি জানতে পারি যে, বিগত ছয় মাস ধরেই নাকি পেটের এই ব্যথাটার কথা সে বারবার বলেছে ওঁকে। ওর শরীরে এটা ছাড়া আর তেমন কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমার কথা শুনে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না নীলাদ্রিবাবু। অন্যদিকে জ্বরের ঘোরেই মৈথিলী বলতে শুরু করল তার পেটের ভিতর থেকে অনেকদিন ধরেই নাকি কিছু একটা আঘাত করে, তাকে খোঁচায়। কৌতূহল বশতই আমি চেক আপ করলাম। তারপরেই এরকম একটা অদ্ভুত জিনিসের সাক্ষী রইলাম।"

কথাটি বলতে বলতে একপ্রকার ভয় পেয়ে গেলেন ডক্টর রূপক হালদার।

তার অবস্থা দেখে ডক্টর কাপাস তার দিকে জল ভরা গ্লাসটি এগিয়ে দিলেন। তাকে ঠাণ্ডা হতে বললেন। কারণ এই রিপোর্ট দেখে তিনিও যথেষ্ট হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন।

ছয়

ডক্টর কাপাস এবং ডক্টর রূপক হালদার কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। এরপর ডক্টর কাপাস ডক্টর রূপকের কাছে মৈথিলীর পরিবার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলেন।

"আমি মৈথিলীর পরিবার সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। তবে নীলাদ্রিবাবুর সাথে দেখা করে এই বিষয়ে জানতে হবে। আজকে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে ওঁর সাথে দেখা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এবার আপনারও যখন একই মত তখন আমার মনে হয় আপনারও আমার সাথে যাওয়া উচিৎ। একসাথেই নয় শুনে নেওয়া যাবে ওঁর মুখ থেকে কথাগুলি। সেগুলি আমাদের কেস স্টাডিতে আরও অনেক বেশিমাত্রায় সহযোগিতা করবে বৈকি!" বললেন রূপকবাবু।

হাতে সময় থাকায় ডক্টর কাপাস ওঁর কথায় রাজি হয়ে গেলেন। রূপকবাবু দেরি না করে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে ফিরে এলেন। ডক্টর কাপাস প্রথমেই গেলেন মৈথিলীর ঘরে। মৈথিলীর তখনও জ্ঞান ফেরেনি। তিনি মৈথিলীকে দেখে একপ্রকার অবাক হয়ে গেলেন। সত্যি মেডিক্যাল সায়েন্সে এরকম ঘটনা তিনিও এর আগে কোনোদিন নিজের চোখে দেখেননি। ছয় মাসের গর্ভবতী একটি মেয়েকে দেখে এতটুকু বোঝার উপায় নেই। এছাড়াও সবথেকে অবাক করা ব্যাপারটি হল মেয়েটির নিজের বয়স মাত্র আট বছর। এমনটা কীভাবে সম্ভব? আবার একবার চিন্তার মেঘ জড়ো হল তার মনের আকাশে।

"আমরা এখানে সময় নষ্ট না করে আগে বরং কাজের কাজটা সেরে ফেলি। এখন তো দু'দিন মৈথিলী আমার অবসারভেশনেই থাকছে। সুতরাং আমরা দুজনেই ওকে চোখে চোখে রাখতে পারব আর সময় মতো ওর চেকআপও করতে পারব। এখন নীলাদ্রিবাবুর সাথে দেখা করে আগে পুরো বিষয়টা আমাদের জানতেই হবে। তবেই আমরা এই রহস্যের জট খুলতে পারব।"

রূপকবাবু কনফিডেন্টলি কথাগুলি বললেন।

নীলাদ্রিবাবু তখন বিছানায় শুয়ে। চোখটা বন্ধ করলেই পুরাতন স্মৃতিগুলি তাকে আজও তাড়া করে বেড়ায়। যদিও জীবনটায় এখন স্মৃতিরোমন্থন ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মৈথিলী আসার আগেও তার একটা জীবন ছিল। অনিন্দিতাকে নিয়ে কত সুখের মুহূর্তই না কাটিয়েছিলেন তিনি। তবে এখন সেসব শুধুই স্মৃতিবিস্মৃতির কথা। যেদিন প্রথমবার দেখেছিলেন অনিন্দিতার মুখটা! আহা কী অসাধারণ লাবণ্যময়ী দৃষ্টি। প্রথম প্রস্ফুটিত কুঁড়ির মতো সুন্দর ছিল তার দু'-চোখের চাউনি। সেদিনই প্রথমবার দেখেছিলেন তাকে। বৃষ্টিতে রাস্তার একপাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা। সেই প্রথম দেখাতেই ভালোবেসে ফেললেন তিনি।

এরপরেই তার সরকারি চাকরির অফারটাও এল। জীবনে যেন লক্ষী এসেছিল। তারপরেই চার হাত এক হল দুজনের। শুরু করলেন নতুন জীবন। আর পিছুটান রইল না। হারিয়ে ফেলার সব ভয়

যেন এক নিমেষে অন্তর থেকে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেছিল। আর খোঁজ করেননি।

তবে মায়ের কথাগুলি আজও তাঁর মনকে আন্দোলিত করে। অনিন্দিতাকে উনি কোনোদিনই মেনে নিতে পারেননি। দিনের পর দিন অনেক অকথা-কুকথা বলতেন তিনি অনিন্দিতাকে। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সব সহ্য করেছে মেয়েটি। তবে কি মায়ের কথাগুলিকেই গুরুত্ব দিয়েছিল সে? স্বামী হয়ে কি কোনো সুখই দিতে পারেননি তিনি তার স্ত্রীকে?

"অনিন্দিতা তুমি কেন আমাকে বললে না? কেন একটা সুযোগ দিলে না আমাকে! একা একাই সব কষ্ট নিঃশব্দে সহ্য করে গেলে তুমি? কেন এমনটা হল! হে ঈশ্বর কোন পাপের শাস্তি দিচ্ছ তুমি আমাকে?" মনে মনে কথাগুলি আওড়াতে লাগলেন নীলাদ্রিবাবু।

আজও ভাবেন যদি একবার অনিন্দিতার প্রকৃত কষ্টের কথা তিনি জানতে পারতেন! তাহলে হয়তো এত বড় অনিষ্ট হতে দিতেন না। মৈথিলীর শাপভ্রষ্ট জীবনকে চোখের সামনে দেখেও আজ তিনি নির্বাক। অপছায়ার মতো পিছু নিয়েছে এক অজানা অভিশাপ। মেয়ের শৈশবকে তিল তিল করে শেষ হতে দেখেও আজকে তাকে বাকরুদ্ধ হয়েই থাকতে হচ্ছে। এই যন্ত্রণার কি কোনো শেষ আদৌ আছে! আবার কি তিনি কোনোদিন শান্তির হাসি হাসতে পারবেন? আবার কি সব ঠিক হবে? ভাবতে ভাবতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

ঠিক এমন সময় ডক্টর রূপক হালদারের সাথে ডক্টর কাপাস নীলাদ্রিবাবুর ঘরে ঢুকলেন। কিছু না জানিয়ে এমন অকস্মাৎ দুজনকে ঘরের মধ্যে আসতে দেখে একটু ঘাবড়ে গেলেন তিনি। ভাবলেন হয়তো মৈথিলীর কিছু হয়েছে, সেইজন্য হাসপাতালের দুজন ডাক্তার এসে উপস্থিত হয়েছেন।

"মৈথিলী ঠিক আছে তো? ওর কিছু হয়নি তো? কী হল আপনারা আমাকে কিছু বলছেন না কেন?"

নীলাদ্রিবাবু বেশ কিছুটা ভয় পেয়েই কথাগুলি বললেন।

"নমস্কার, আমার নাম ডক্টর এম. এম. কাপাস। আর ওঁকে তো আপনি চিনবেনই, ডক্টর রূপক হালদার। আপনার মেয়ে ভালোই আছে। আপনি শুধু শুধু এত দুশ্চিন্তা করবেন না। আসলে আমরা আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু কথা জানতে এসেছি, হতে পারে কোনো না কোনোভাবে এই বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যদি আপনি আমাদের এ বিষয়ে কিছু বলেন তবে মৈথিলীর বিষয়টা আমাদের কাছে অনেকটাই পরিষ্কার হতে পারে। আমাদের চিকিৎসা করার ক্ষেত্রেও এটি অনেকভাবে আমাদের সুবিধা প্রদান করবে।"

ডক্টর কাপাস কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলতে পেরে অনেকটাই স্বস্তি অনুভব করলেন।

দুজন ডাক্তারের আর্জি ফেলতে পারলেন না নীলাদ্রিবাবু। প্রথম দিকে একটু ইতস্তত বোধ করলেন ঠিকই কিন্তু তার পর থেকে বেশ উত্তেজনার সাথেই কথাগুলি বলতে শুরু করলেন। যেন এতদিনে তার অন্তরের ভাষাগুলি কণ্ঠ পেল।

সাত

"আমি কারুর কাছেই এই ঘটনার বিবরণ দিইনা। এই ঘটনা আমার নিজের জীবনকে একেবারে ছারখার করে দিয়েছে। এই ঘটনার কথা মুখে আনলেও কোনো অঘটন ঘটতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। তবুও যখন আমার মেয়ের জীবনের সাথে এই ঘটনার কোথাও না কোথাও একটি যোগসূত্র তৈরি হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন, তখন আমি নিশ্চয়ই বলব।

"আমার বয়স তখন পঁচিশ। কলকাতায় চাকরি পাবার পরে এখানেই পাকাপাকি ভাবে থাকবার বন্দোবস্ত করে ফেললাম। আমার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন ভালো ছিলনা। আমার পিতা সদ্যই গত হয়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসার দরুন প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছিল। ফলে আমাদের অবস্থা তখন প্রায় নিঃস্ব। এই অবস্থায় আমার চাকরিটাই ছিল পরিবারের একমাত্র সম্বল। বাড়িতে নিজের বলতে ছিলেন শুধু মা। প্রায় দু'বছর চাকরি করলাম। অবস্থার একটু পরিবর্তন হবার পরে মা ঠিক করলেন আমার বিয়ে দেবেন। তবে আমি একটি মেয়েকে বহুদিন ধরেই ভালোবাসতাম। মাকে কোনোদিন সেই ব্যাপারে কিছু জানাইনি। মেয়েটির নাম ছিল অনিন্দিতা।

"অনিন্দিতাদের পরিবার ছিল অবস্থাপন্ন। বাড়ির একমাত্র আদরের মেয়ে। বাবা মায়ের নয়নের মণি। আমার মতো একটি সাধারণ ঘরের ছেলেকে কোনোদিনও ওর বাড়ি থেকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। অগত্যা আমরা পালিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলাম। প্রথমে আমাদের বিয়েটা কেউই মেনে নেননি। তবে ধীরে ধীরে পরিবেশ অনেকটাই শান্ত হয়ে গেল। আমরাও বেশ নিশ্চিন্তে সংসার করতে লাগলাম। কিন্তু অনিন্দিতা মা হতে পারছিল না। ফলে প্রায়শই আমার কাছে চোখের জল ফেলত। সংসারের প্রতি তার ভালোবাসা প্রায় চলে যেতেই বসেছিল। আমিও খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের বিয়ের আট বছরের মাথায় মৈথিলীর জন্ম হয়। তারপর আমাদের সংসার বেশ আনন্দের সাথেই অতিবাহিত হতে থাকে। মৈথিলীর বয়স যখন চার বছর, সেই সময় অনিন্দিতা আবার সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই সন্তান আর পৃথিবীর আলো দেখতে পারেনি। ভ্রূণের বয়স যখন ছ'মাস তখন হঠাৎ একদিন অনিন্দিতা আত্মহত্যা করে।"

আত্মহত্যার কথা শুনেই ডক্টর কাপাস চমকে উঠলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "গর্ভাবস্থায় আত্মহত্যা করলেন কেন তিনি?"

নীলাদ্রিবাবু কিছুটা শান্ত স্বরেই উত্তরটা দিলেন, "আমিও ঠিক বলতে পারব না। অনিন্দিতার এমন আকস্মিক মৃত্যুর পিছনে কোনো কারণ থাকতে পারে কিনা আমার সত্যিই জানা ছিল না। সে কোনো আত্মহত্যার নোটও রেখে যায়নি। সন্দেহটা অনেক দিকেই কাজ করেছিল তবে নির্দিষ্ট করে কিছুই সেদিন বুঝতে পারিনি। এমনকী আজও এর সঠিক কারণ কী তা আমি সত্যিই জানিনা। ওর লাশটা সিলিং-এর সাথে ঝুলছিল। আমার চোখের সামনে দিয়ে ওর ডেডবডিটা পুলিশ পোস্টমর্টেমের জন্য

সেদিন নিয়ে গেল। মৈথিলী ভালো করে কথা বলতে শেখেনি তখনও। আমাকে জাপটে ধরে দাঁড়িয়েছিল। বারবার কী যেন একটা বলার চেষ্টা করছিল কিন্তু বলতে পারছিল না। কিন্তু সে এটুকু বুঝতে পেরেছিল জীবনের পরম স্নেহ থেকে সে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হয়ে গেছে।

"পুলিশের সন্দেহের আঙুল উঠল আমার দিকে। তারা সন্দেহ করেছিল আমিই নাকি আমার স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছি। আমাকেও তারা ধরে নিয়ে যায়। আমার মায়ের চোখের সামনে দিয়ে আমাকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ছোট্ট মৈথিলীকে আমি আমার মায়ের কাছে রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। একটানা চারমাস আমাকে জেলে কাটাতে হয়েছিল। পুলিশ কোনো প্রমান না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে কিছুতেই ছাড়তে রাজি ছিলনা। তবে শেষ পর্যন্ত যখন তারা আর কিছুই প্রমাণ করতে পারল না তখন আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। কিন্তু বাড়িতে ফিরে দেখলাম আমার মা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অনিন্দিতাকে মা নিজের মেয়ের মতোই দেখতেন, তার চলে যাওয়াকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। অন্যদিকে আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছিল তাঁর চোখের সামনে দিয়ে, ফলে আমার মা সেই কষ্টও সহ্য করতে পারেননি। আমি জেল থেকে ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই আমার মাও আমাকে ছেড়ে চিরকালের মতো চলে গেলেন। এক বছরের মধ্যেই আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় দুজন কাছের মানুষকে হারিয়ে ফেললাম। এই ঘটনার কিছু সময়ের মধ্যেই আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সকলেই আমাকে সন্দেহ করতে থাকে, এমনকী আমার মেয়ে মৈথিলীকে তারা অপয়া বলে দূরে ঠেলে দিতেও একবার ভাবেনি।"

নীলাদ্রিবাবু কথাগুলি বলার পর পুনরায় কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

"আপনারাই বলুন একজন পিতা হিসাবে তখন আমার যা করনীয় ছিল, আমি সেটা করে কি খুব ভুল করেছি? আমার মেয়েটাকে আমি নিশ্চয়ই সকলের মতো অপয়া বলে ত্যাগ করতে পারতাম না। তাই আমি কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে মফঃস্বলে একটি ফ্ল্যাট কিনে সেখানে মৈথিলীকে নিয়ে থাকতে শুরু করি। কিন্তু সেখানেও শান্তি পেলাম ক্ষণিকের জন্যই। মৈথিলী যখন আট বছরে পড়ল তখন সে ক্রমাগতভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকল। আমি এর সঠিক কোনো কারণ খুঁজে বার করতে পারলাম না। বহু ডাক্তারের দ্বারস্থ হয়েছি। কিন্তু সকলের কাছ থেকেই নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। এমন একটি রোগের কথা তারা আমার সামনে তুলে ধরলেন যার কোনো চিকিৎসা হয়না। একটি আট বছরের মেয়ের গর্ভে নাকি ছয়মাসের একটি সন্তান রয়েছে। আপনারাই বলুন একজন পিতার পক্ষে কি এমনটা মেনে নেওয়া কোনোদিন সম্ভব? কিন্তু তবুও আমি হার মানলাম না। আমি সমস্ত বড় বড় ডাক্তারদের কাছে গেলাম, তবুও কোনো নতুন আশার আলো খুঁজে পেলাম না। সবার মুখে একটাই কথা, এমন জিনিস তারা জীবনে কোনোদিনও দেখেননি। চিকিৎসা জগতে নাকি এই ঘটনা আগে কোনোদিনও ঘটতে দেখা যায়নি। আর আজকে আপনারাও সেই একই কথাই বললেন আমাকে। এবার আপনারাই বলুন আমার কাছে আত্মহত্যা করা ব্যতীত আর কোনো পথ খোলা রয়েছে কি? কারণ নিজের হাতে পিতা হয়ে নিজের মেয়েকে শেষ করে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।" – অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে কথাগুলি বলতে বলতে নীলাদ্রিবাবু কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

ডক্টর কাপাস এবং ডক্টর রূপক হালদার দুজনেই চুপ করে রইলেন। এই অবস্থায় একটা মানুষকে কীভাবেই বা সান্ত্বনা দেওয়া সম্ভব! তবুও ডক্টর কাপাস বললেন, "আপনি এত ভেঙে পড়বেন না নীলাদ্রিবাবু। আমি দেখছি একবার শেষ চেষ্টা করে যদি এই বিপদ থেকে আমি মৈথিলীকে ফিরিয়ে আনতে পারি?"

নীলাদ্রিবাবুকে ঘরে রেখে ওরা দুজনেই বেরিয়ে এলেন। মৈথিলীকে দেখলেন, তখনও অচেতন অবস্থাতেই সে পড়ে রয়েছে। ডক্টর কাপাস বললেন, "রূপক আমাদের একবার অপারেশন করতেই হবে। আদৌ মৈথিলীর পেটে কোনো বাচ্চার উপস্থিতি রয়েছে কিনা সেটা না জানা পর্যন্ত আমি কোনোভাবেই বাইরে থেকে ওর কোনো চিকিৎসা করতে পারব না।"

ডক্টর রূপকও তাঁর পরামর্শে সম্মতি দিয়েই বললেন, "তবে আর দেরি কেন? আগামীকালই মৈথিলীর অপারেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।"

আট

ডক্টর কাপাস তার চেম্বারে ফিরে এলেন। একটি আট বছরের মেয়ের এমন অবস্থা তাকে বেশ ভাবাতে থাকে। রিপোর্টগুলো পুনরায় একবার দেখে নিলেন তিনি।

পরেরদিন খুব সকালেই তিনি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। মৈথিলীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা সেই নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে লাগলেন তিনি। হাসপাতালে পৌঁছেই তিনি মৈথিলীর কেবিনে গেলেন। নীলাদ্রিবাবু তখন নিজের মেয়ের পাশে বসে। ডক্টর রূপক তাঁকে মৈথিলীর অপারেশনের ব্যাপারটা বোঝাচ্ছিলেন। ডক্টর কাপাসকে দেখেই নীলাদ্রিবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"আপনি আমাকে গতকাল জানাননি কেন? আপনারা আমাকে না জানিয়েই কীভাবে আমার মেয়ের অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারেন?"

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে কথাগুলি বললেন নীলাদ্রিবাবু।

ডক্টর কাপাস তাঁকে ইশারায় শান্ত থাকতে বললেন।

"আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে মিস্টার নীলাদ্রী! তাহলে আমি একবার আপনার মেয়ের সাথে একলা কথা বলতে চাই। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে আমি একবার আপনার মেয়ের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে নিতে চাই। তারপর আমি আপনার সাথে এই বিষয়ে কথা বলব। আশা করব এক্ষেত্রে আপনি আপত্তি করবেন না।"

ডক্টর কাপাস অত্যন্ত শান্ত সুরে এই কথাগুলি বললেন।

ডক্টর কাপাসের কথায় নীলাদ্রীবাবুর বিশ্বাস হল। তিনি তাঁদের কিছুক্ষণের জন্য একা ছেড়ে দিতে আপত্তি করলেন না। তবে নতুন কোনো সন্দেহের বীজ যে তার মনেও দানা বাঁধতে শুরু করেছে তা তিনি তাঁর ভাবভঙ্গির মাধ্যমে খুব ভালোভাবেই প্রকাশ করে দিলেন।

ডক্টর রূপককেও তিনি অনুরোধ করলেন বেরিয়ে যাবার জন্য। বিষয়টা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হওয়ার জন্যই যে ডক্টর কাপাস এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে বিষয়টা তিনি জানতেন। তাই তিনিও কিছু না বলে ওদের একা রেখে বাইরে গেলেন।

ডক্টর কাপাসকে দেখে মৈথিলী একটু অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু ওঁর ব্যবহার দেখে তার ভয় কিছুটা হলেও কমল।

"আচ্ছা মা মৈথিলী, তোমার পেটে কি কোনোরকম যন্ত্রণা হয়?"

মৈথিলী শান্ত স্বরে উত্তর দিল, "মাঝেমধ্যে খুব যন্ত্রণা হয়। মনে হয় কেউ আমার ভেতর থেকে খোঁচাচ্ছে। কখনও আবার এটাও মনে হয় আমার পেটের ভিতরে কী যেন একটা নড়ছে।"

ডক্টর কাপাস মৈথিলীর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘরের বাইরে গেলেন। ডক্টর রূপক তখনও নীলাদ্রীবাবুকে বোঝাতে ব্যস্ত।

ডক্টর কাপাস বললেন, "রূপক তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।"

নীলাদ্রীবাবু তখন বেশ কিছুটা শান্ত হয়েছেন। ওঁকে পাশের কেবিনে বসিয়ে রূপকবাবু ডক্টর কাপাসের সঙ্গে কথা বলতে এলেন।

ডক্টর কাপাস বললেন, "আমার মনে হয় মৈথিলীর বিষয়টা বেশ জটিল। এই মুহূর্তে অপারেশন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

ডক্টর রূপকও তাঁর কথায় সম্মতি দিয়ে বললেন, "আপনার কোনো চিন্তা নেই। আমি নীলাদ্রীবাবুকে কিছুটা হলেও রাজি করাতে পেরেছি। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।"

অন্যদিকে নীলাদ্রীবাবু মৈথিলীকে দেখতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। মৈথিলী শুয়ে রয়েছে। সে জানেও না তার সঙ্গে একটু বাদেই কী হতে চলেছে? মেয়েটার মুখটা হয়েছে হুবহু মায়ের মতোই। হঠাৎ অনিন্দিতার কথা মনে হতেই তাঁর চোখটা ঝাপসা হয়ে গেল। তাঁর চোখের জল যেন অনিন্দিতাকে ঘিরে তার সমস্ত স্মৃতিগুলিকে একত্রিত করছিল। তাঁদের জীবনে এক দীর্ঘসময় পর তারা মৈথিলীকে পেয়েছিলেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার ফল ছিল সে। কত আনন্দেই না কাটছিল তাঁদের দিনগুলি।

মনটা খুশিতে একইভাবে ভরে উঠেছিল যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন অনিন্দিতা আরেকবার মা হতে চলেছে। কিন্তু এই সংবাদের পরেই তাদের সংসারে অন্ধকার নেমে এল। সবথেকে অবাক করেছিল অনিন্দিতার কথাগুলি। সে বলেছিল, "আমাদের তো একটা সন্তান আছেই, তাহলে আরেকটা সন্তান নিয়ে আমরা কী করব? গর্ভে যে আছে তাকে গর্ভপাত করে ফেলি?"

কথাটা শুনে নীলাদ্রীবাবু চমকে উঠেছিলেন। কারণ অনিন্দিতার কাছ থেকে এমন কোনো কথা তিনি আশাই করেননি। অনিন্দিতাকে এক ধমকে চুপ করিয়ে দিতে পেরেছিলেন সেদিন। গর্ভের সন্তান নিয়ে অনিন্দিতার দুশ্চিন্তা যেন বেড়েই চলেছিল। তিনি আসলে কোনোমতেই অনিন্দিতার সিদ্ধান্তে রাজি হতে চান নি। কারণ তাঁর কাছে ভ্রূণ হত্যা মহাপাপ বলে মনে হয়েছিল। অনিন্দিতার এই অবাস্তব ইচ্ছেগুলি সেদিন তাঁর কাছে কোনোভাবেই মর্যাদা পায়নি। এর ফলেই অঘটনটি ঘটেছিল।

একদিন অফিস থেকে ফিরেই দেখলেন বাড়ির বাইরের গেটটি খোলা। ভিতর থেকে অনেকের চিৎকারের শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। মনের ভয়টা বেড়ে গেল। সময় নষ্ট না করে ঘরে ঢুকে পড়লেন। দ্রুত ঘরে ঢুকতেই দেখলেন মৈথিলী অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে মেঝেতে। সিলিং-এর সঙ্গে অনিন্দিতার দেহটা ঝুলছে। জিব বেরিয়ে এসেছে। বড় বড় চোখগুলো যেন তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। এই মৃত্যুর কারণ তাঁর আর জানা হয়নি। এরপর থেকেই তাঁর জীবন এলোমেলো হয়ে যায়। নতুন করে সংসার সাজানোর স্বপ্ন নীলাদ্রীবাবু আর কোনোদিনও দেখতে পারেননি। মৈথিলীকে নিয়েই গোটা জীবনটা কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর মনে মৈথিলীর জীবন নিয়েও নতুন ভয় দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তাঁর মনে হচ্ছে আর কিছুদিনের মধ্যে সেও হয়তো তার মায়েরই মতো

তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে চিরকালের মতো। আর কোনোদিন হয়তো তাকে তিনি দেখার সুযোগ পাবেন না।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই মৈথিলী আর কোনোদিন স্বাভাবিক হতে পারেনি। অনিন্দিতার মৃত্যুর পর থেকেই তিনি যতজন লোককে বাড়ি দেখাশোনার জন্য তথা বাড়ির কাজ করার জন্য রেখেছিলেন তাঁদের কেউই বাড়িতে বেশিদিন থাকতে পারেননি। তাঁদের চলে যাওয়ার পিছনে ছিল অদ্ভুত সমস্ত কারণ। কাজের লোকেরা বাড়িতে নাকি ছায়া দেখতেন। বাড়ির আনাচে কানাচে তাঁরা নাকি অজস্র ছায়াকে দেখতে পেতেন যারা তাঁদেরকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসত। অনেকসময় তাঁদেরকে মারবারও চেষ্টা করত। সবগুলো ছায়াই নাকি অনিন্দিতার গলায় তাঁদের সঙ্গে কথা বলত। কিম্বা তাঁদের প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকত। তাঁদেরকে নাকি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলত। পরবর্তীকালে যে নতুন লোকেদের কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি, তাঁদেরকে আর অনিন্দিতার ছবি দেখাননি। পাছে তারা ভয় পান! কিন্তু তাঁরাও নাকি একইভাবে ভয় পেয়েছিলেন এমনকী তাঁদের সঙ্গেও নাকি একই ঘটনা ঘটতে থাকে। বিষয়টা ক্রমাগতভাবে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে শুরু করেছিল।

তবে ছোটবেলা থেকেই মৈথিলী এমন হঠাৎ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ত। একটানা অনেকদিন জ্বর থাকত, মৈথিলী কিছুই খেতে পারত না। শরীর ক্রমাগতভাবে দুর্বল হতে থাকল ওর। ফলে মৈথিলীর শরীরটা নিয়ে তিনি বরাবরই চিন্তিত ছিলেন। এতদিন ধরে যে ডাক্তারের কাছেই তিনি মৈথিলীকে নিয়ে গেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই মৈথিলীর সম্পর্কে এমন অদ্ভুত কথাই বলেছেন। মেডিক্যাল রিপোর্ট যে কখনও মিথ্যা হতে পারেনা তেমনটা তিনিও খুব ভালো করেই জানতেন। তবুও আশা ত্যাগ করতে পারেননি। কিন্তু আজকেও যখন সেই একই কথাই তাকে শুনতে হল তখন ঈশ্বরের প্রতি তাঁর শেষ বিশ্বাস আর ভরসাটুকুও প্রায় উঠেই গেল।

নয়

মৈথিলীর অপারেশনের কথা শুনে নীলাদ্রীবাবু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। মৈথিলীকে এ বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি। একটা বাচ্চা মেয়ে কীইই বা বুঝবে এইসমস্ত ব্যাপার? সে তো এটুকুই জানে না যে তার সাথে এমন ভয়ঙ্কর কিছুও ঘটতে পারে!

কিছুক্ষণ পরেই মৈথিলীকে শহরের একটি বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই হাসপাতালে ডাক্তার কাপাস এবং ডক্টর রূপক হালদার উভয়ই অপারেশনের কাজ করে থাকেন। হাসপাতাল থেকে সমস্ত রকমের পরিষেবা পাওয়া সম্ভব তাই এখানেই মৈথিলীর অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেন তারা।

মৈথিলীর অবস্থার উন্নতির স্বার্থে নীলাদ্রীবাবুও রাজি হয়ে যান। মৈথিলীকে অপারেশন রুমে নিয়ে যাওয়া হল। অথচ তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। নীলাদ্রীবাবু চিন্তায় মুখ কালো করে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। অপারেশন রুমের লাল বাতি জ্বলে উঠল। মৈথিলীর জীবন এখন এই দুই ডাক্তারের হাতে। পর্যবেক্ষণের দ্বারা যে সত্য সকলের সামনে এসেছে তার নিরাময় আদৌ সম্ভব কিনা ভাবতে ভাবতে বসে পড়লেন নীলাদ্রীবাবু।

প্রায় এক ঘন্টা কেটে গেছে। তখনও অপারেশন চলছে। ভিতরে কী হচ্ছে, বাইরে এসে কোনো নার্স বা ডাক্তার খবরও দিয়ে যাননি। চিন্তার কালো মেঘটা আরো বেশি করে প্রকট হতে লাগল। হঠাৎ নীলাদ্রীবাবু দেখলেন ওটি থেকে বেরিয়ে আসছেন দুজন ডাক্তার। অর্থাৎ অপারেশন তাহলে শেষ হয়েছে।

নীলাদ্রীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুত তাঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মৈথিলী ঠিক আছে তো? আশা করি আপনাদের অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে। আর কোনো চিন্তার কারন নেই তো?"

নীলাদ্রিবাবুর কথার উত্তরে দুজন ডাক্তারের কেউই তেমন ভাবে সাড়া দিলেন না। বিষয়টা বড়ই অদ্ভুত ঠেকল।

গম্ভীর কণ্ঠে ডক্টর কাপাস বলে উঠলেন, "আপনার মেয়ের কিছুই হবে না। শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করবেন না। সে অচেতন হয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার জ্ঞান ফিরবে। তখন আপনি তার সাথে গিয়ে দেখা করতে পারবেন। ওকে বেডে দিয়ে দেওয়া হবে খুব শীঘ্রই। কালকেই আপনি ওকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন।"

ডক্টর রূপক হালদার এবং ডক্টর কাপাস দুজনের মুখেই মাস্ক পরা। তাঁদের চোখ ভয়ঙ্কর রকমের লাল। এই চোখ আর ডক্টর কাপাসের অদ্ভুত চাপা কণ্ঠের কথা শুনে চমকে উঠলেন নীলাদ্রীবাবু। এমন আচরণ করতে তিনি তাঁদের এর আগে দেখেননি। অপারেশন সাকসেসফুল হলে তাঁরা এরকম অদ্ভুত আচরণ করতেন না। কিন্তু তাঁদের মুখের কথার সঙ্গে চোখমুখের ইঙ্গিত মিলছে না। অন্যদিকে এত বড় অপারেশনের পরে একদিনের মধ্যেই পেশেন্টকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন এই কথাটা

শুনেও তিনি বেশ অবাক হলেন। ডক্টর কাপাস এবং ডক্টর রূপক হালদার কথা না বাড়িয়ে নীলাদ্রি বাবুকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত চলে গেলেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই অচেতন মৈথিলীকে বেডে স্থানান্তর করা হল। প্রায় গোটা দিন সে অচেতন অবস্থাতেই পড়ে রইল। রাতের দিকে মৈথিলীর ঘুম ভাঙলো। চোখ খুলেই সে চেপে ধরল নীলাদ্রিবাবুর হাতটা।

"বাবা, পেটে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। কেউ যেন ভেতর থেকে খোঁচাচ্ছে।" আর্ত কণ্ঠে বলে উঠল মৈথিলী।

নীলাদ্রীবাবু চমকে উঠলেন। মৈথিলীর অপারেশনের কাপড় সরিয়ে পেটের কাছটা ভালো ভাবে নজর করলেন, কোথাও অপারেশনের কোনো চিহ্ন তিনি দেখতে পেলেন না। এরই মধ্যে হাসপাতালে একজন নার্স এসে ভয়ঙ্কর একটি সংবাদ দিলেন তাঁকে। ডক্টর কাপাস এবং ডক্টর রূপক হালদার দুজনেই নাকি হাসপাতালের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে মারা গেছেন। কথাটি শুনে নীলাদ্রিবাবুর হৃৎপিন্ডের স্পন্দন থেমে যেতে চাইল। ক্ষণিকের জন্য মনে হল পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। একটু আগেই তাঁদের দুজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। বেশ অনেকটাই অদ্ভুত প্রকৃতির আচরণ করছিলেন তারা। কিন্তু এরকম একটি পদক্ষেপ নেওয়ার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে তা সেই মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন না। একের পর এক ঘটনাগুলো নীলাদ্রিবাবুর জীবনকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে? কী হচ্ছে এসব? মৈথিলীর অপারেশন কেন করা হল না? ডাক্তার কাপাস এবং রূপক হালদার শুধু শুধু অপারেশনের নাটকটাই বা করলেন কেন? নীলাদ্রিবাবুর মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। তিনি নার্সের কাছে জানতে চাইলেন, "আজকে সকালে মৈথিলীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলেও অপারেশন কেন করেননি তারা?"

নার্স কথাটা শুনে চমকে উঠলেন। নীলাদ্রিবাবুর কথা মানতে চাইলেন না। কারণ তিনিও আজকে ডাক্তারদের সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারে ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ মৈথিলীর পেটে সেলাইয়ের দাগ যেই দেখাতে যাবেন তখন তিনি আরও বিস্মিত হলেন। তার পেটে অপারেশনের কোনো চিহ্নই নেই। বিস্মিত কণ্ঠে তিনি নীলাদ্রিবাবুকে বললেন, "স্যার এমনটা কখনোই হতে পারে না। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে উভয় ডাক্তারকেই কিছুক্ষণ আগে অ্যাসিস্ট করেছি। তাঁরা সেলাইও করলেন আমার চোখের সামনে। তবে অপারেশনের মাঝপথে কীসের জন্য যেন আমিসহ বাকি দুজন নার্সকে অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করে দিলেন তাঁরা। অপারেশন শেষে আবার এসে মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে বেডে শুইয়ে দিতে বললেন। তাহলে এখন মেয়েটির পেটে অপারেশনের কোনো চিহ্ন নেই কেন?"

নার্সের কথায় নীলাদ্রীবাবু বেশ বিরক্ত হলেন। ওঁদের কারোর কথার সাথেই তাঁদের কাজের কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশ্য তিনি মৈথিলীর বর্তমান অবস্থা দেখে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলেন। মেয়েটা যদিও বলছে তার পেটে এখনো যন্ত্রণা হচ্ছে কিন্তু মেয়েটাকে দেখে পুরোপুরি সুস্থ লাগছিল তাঁর। এক বেলার মধ্যেই যেন চেহারার মাঝে সব ক্লান্তি মুছে গেছে। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘটে

যাওয়া সমস্ত ঘটনাকে এক নিমেষে ভুলে যেতে চাইলেন। ডাক্তারদের বিষয়টা তাঁর মনের মধ্যে ঘুরপাক খেলেও তিনি সেই বিষয়ে মৈথিলীর সঙ্গে কোনো আলোচনা করতে চাইলেন না। খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতালের বিল মিটিয়ে দিয়ে মৈথিলীকে নিয়ে বাড়িতে এলেন।

দশ

মৈথিলী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এখন। গায়ে জ্বর নেই, শরীরে দুর্বলতা নেই। অপারেশনটার যদিও কোনো চিহ্ন নেই তবুও এই অদৃশ্য অপারেশনটাই যেন মৈথিলীকে আবার সুস্থ করে দিয়েছে। যদিও এরকম সুস্থ মৈথিলী এর আগেও অনেকবার হয়েছে। কিন্তু তার সুস্থতা এবং অসুস্থতার মাঝখানে কোনো-না-কোনো ভয়ঙ্কর ঘটনার সূত্রপাত রয়েই গেছে। যতবার তার প্রাণ সংশয়ের প্রশ্ন উঠে এসেছে, ততবার অন্য কারোর প্রাণ গেছে। আজকের ঘটনাটিই ছিল তার কাছে জ্বলন্ত উদাহরণ। অনেকে তো তাকে অনিন্দিতার মৃত্যুর জন্যও একসময় দায়ী করেছিল তবে পিতা হয়ে তিনি কোনোদিনই তা মানতে চাননি।

মৈথিলীকে তিনি বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মৈথিলী বহুবার নিজের সুস্থতাকে জাহির করার চেষ্টা করলেও নীলাদ্রীবাবু তাকে শুয়ে থাকতে বললেন। এখন আর মৈথিলীকে নিয়ে তিনি ভাবছেন না। ভাবছেন ওই দুই আত্মঘাতী ডাক্তারকে নিয়ে। ওরা হঠাৎ আত্মহত্যা করলেন কেন? অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হওয়ার পরেই তাদের ব্যবহার বেশ অস্বাভাবিক লেগেছিল তার। সেই লাল চোখ, গম্ভীর কণ্ঠস্বর! তাহলে কি তাদের আত্মহত্যার সঙ্গে মৈথিলীর অপারেশনের কোনো যোগসূত্র আছে?

নীলাদ্রীবাবু ভাবলেন একবার ডক্টর রূপক হালদারের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবেন। তবে মৈথিলীকে বাড়িতে একা রেখে যাওয়াটাও তার সঠিক মনে হল না। তবে মৈথিলী যেহেতু অনেকটাই সুস্থ অনুভব করছিল তাই তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছুক্ষণের জন্য তিনি বাড়ির বাইরে গেলেন। ডক্টর রূপক হালদারের বাড়িতে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন তার বডি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হয়েছে। হসপিটালের ছাদ থেকে দুই ডাক্তার ঝাঁপ দিয়ে যেভাবে আত্মহত্যা করেছেন সেটি বড়ই অস্বাভাবিক। রুপক বাবুর পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। যতটুকু জানতে পারলেন তা থেকে তার সন্দেহ আরো বেড়ে গেল।

রূপকবাবু বেশ কয়েকদিন ধরেই নাকি চিন্তান্বিত ছিলেন। গত এক সপ্তাহ ধরে তিনি নাকি হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে পরিবারের কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলতেন না। বেডরুমে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিতেন। রূপকবাবু প্রায়ই যখন কোনো অপারেশনে ব্যর্থ হতেন তখন এমনভাবেই ঘন্টাখানেক চুপচাপ দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতেন। এমন অবস্থায় কোনোদিনই তাঁর পরিবারের লোক তথা স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা তাকে বিরক্ত করতেন না। তবে ইদানীং তাঁর দুশ্চিন্তা যেন ক্রমাগতভাবে বেড়েই যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে বাড়িতে ফিরে বড় অদ্ভুত আচরণ করতেন। শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। অথচ ইদানীং বাড়িতে ফিরে কোনো কারণ ছাড়াই সকলের উপর চিৎকার-চেঁচামেচি করতেন। ঠিক সময় খাওয়াদাওয়া করতেন না। ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র ছড়িয়ে-

ছিটিয়ে রাখতেন। এমনকী একটি ভারী জিনিস ছুঁড়ে আয়নার কাচ অবধি ভেঙে ফেলেছিলেন তিনি। এত শান্ত শিষ্ট একজন মানুষের এমন উগ্র আচরণের পেছনে কোনো কারণ থাকতে পারে কিনা তা পরিবারের কেউই অনুমান করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর পরিণতি যে এতটা করুণ এবং ভয়ঙ্কর হতে পারে সে বিষয়েও তাঁদের কোনো পূর্ব অনুমান ছিল না। এই কথাগুলি নীলাদ্রিবাবুকে আরো বেশি সমস্যার মুখে ফেলল।

তিনি জানতে পারলেন ডক্টর কাপাসের সঙ্গেও ডক্টর রূপকের তেমন কোনো গণ্ডগোল হয়নি যার দরুন তাঁদের দুজনকে এভাবে আত্মঘাতী হতে হবে। তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের জীবিকা নিয়ে যথেষ্ট আনন্দিত ছিলেন। সুতরাং নীলাদ্রিবাবুর এই বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হল না যে মৈথিলীর চিকিৎসা শুরুর পর থেকেই রূপকবাবুর এমন সমস্যা শুরু হয়েছিল।

নীলাদ্রীবাবু এই সুযোগে একবার ডক্টর কাপাসের ফ্ল্যাটেও গেলেন। তিনি অবশ্য এখানে থাকতেন না, বেশিরভাগ সময়ই ইংল্যান্ডে কাটাতেন। কখনো-সখনো কলকাতায় এলে তিনি এই ফ্ল্যাটে উঠতেন। ডক্টর রূপকের মতো তিনিও প্রায় একই আচরণ শুরু করেছিলেন গত কয়েকদিন ধরে। এই দুজনের আত্মহত্যার কারণ জানতেই পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। তাদের ধারণা এই দুজন স্বনামধন্য ডাক্তারকে কোনো একটি বিষয় নিয়ে হয়তো ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল। অথচ নীলাদ্রীবাবু ভেবে দেখলেন, দুজন ডাক্তারকে দেখে তাঁর কখনোই মনে হয়নি তাঁরা কোনো সংকটে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ওঁরা দুজনেই খুব স্বাভাবিক এবং সাবলীল ব্যবহার করেছিলেন। সমস্ত ঘটনাগুলি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছিল তার কাছে।

পুলিশের কাছ থেকে তিনি আরো জানতে পারেন, দুজন ডাক্তারের কেউই কোনো সুইসাইড নোট রেখে যাননি। কথাটি শোনা মাত্রই নীলাদ্রিবাবুর মনে পাপবোধ কাজ করতে শুরু করেছিল। নিজের স্ত্রী অনিন্দিতার কথাগুলি তাকে বারবার আঘাত করছিল। কারণ মৃত্যুর পূর্বে তিনিও কোনো সুইসাইড-নোট রেখে যাননি।

তবে নীলাদ্রীবাবু নিজের মনকে শান্ত করলেন। ভাবলেন তাঁর সঙ্গে এবং মৈথিলীর সঙ্গে উভয় ডাক্তারেরই আগে কোনো পরিচয় ছিল না। ফলে তাঁরা হয়তো অন্য কোনো কারণেই আত্মহত্যা করেছেন। মৈথিলীর সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। মৈথিলীর গর্ভে ভ্রূণ রয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে হয়তো তাঁদের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছিল। অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার পরে তাঁরা হয়তো এই বিষয়টি আবার নতুন করে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন। তাই বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করে অপরেশন না করেই তারা বেরিয়ে যান অপারেশন থিয়েটার থেকে। ভুল পর্যবেক্ষণের ফলে তাঁদের নীলাদ্রিবাবুর কাছে জবাবদিহি করতে হতে পারে এই ভেবেই হয়তো তাঁরা নিরাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। এতকিছুর পরেও নীলাদ্রিবাবুর মনটা তখনো পড়ে থাকে সেই একই জায়গায়। বারবার একই কথা মনে হতে থাকে। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছেন তিনি দীর্ঘ সময় ধরে। তবুও মৈথিলীর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হতে তিনি দেখেননি। ফলে সমাজের কাছে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথার লোক বলে নিজেকে পরিচয় দিলেও মনের মধ্যে ঝড়টা চলতে লাগল।

নীলাদ্রীবাবু ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

ঘড়িতে তখন রাত ন'টা।

বাড়িতে আসতেই তিনি মৈথিলীকে বললেন, "আজ বাড়িতে রান্না হবে না। তুমি রাগ কোরো না মা। তুমি কী খেতে চাও আমাকে বলো। আমি বাইরে থেকে খাবার অর্ডার দিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি।"

মৈথিলী বেশ উত্তেজিত ভাবেই বলল, "আমার খাবার ইচ্ছে নেই।"

নীলাদ্রীবাবু ভালো করে লক্ষ্য করলেন, মৈথিলীর চোখদুটো রক্তবর্ণ। এই সামান্য বিষয়ে এতটা রেগে যাবার সত্যি কোনো কারণ আছে কি? এর আগে তিনি মৈথিলীকে এতটা উত্তেজিত কখনোই দেখেননি। কথা না বাড়িয়ে চটপট মোবাইলটা নিয়ে কাজ সেরে ফেললেন তিনি, চিকেন স্যুপ আর রুটি অর্ডার করে দিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই চলে আসার কথা। প্রায় এক ঘন্টা পার হয়ে গেল। তবুও কেউ ডেলিভারি দিতে যখন এল না তখন নীলাদ্রীবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। অর্ডারটি ক্যানসেল করে যখন পুনরায় অর্ডার করতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ ঘরের প্রধান দরজা ধাক্কানোর আওয়াজ পেলেন তিনি।

তাহলে বোধহয় খাবার এসেছে!

এগারো

জোরে জোরে দরজা ধাক্কানোর আওয়াজ শুনতে পেয়ে নীলাদ্রীবাবু চমকে উঠলেন। ইদানীং কলকাতা শহরে চোর ডাকাতেরও উপদ্রব বেড়েছে। এছাড়া তাঁকে সন্দেহ করে পুলিশও তো আসতেই পারে। তিনি ভয় না পেয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মৈথিলীও বেশ ভয় পেয়ে গেল। এত জোরে দরজা ধাক্কানোর শব্দ তাকে বিব্রত করছিল।

দরজা খুলতেই দেখলেন ডেলিভারি দিতে এসেছেন একটি ছেলে। পরণে লাল রঙের টিশার্ট আর জিন্সের প্যান্ট। ছেলেটি খাবারের প্যাকেটটি হাতে নিয়ে থরথর করে কাঁপছে।

"আমাকে আপনি বাঁচান দাদা। আমি এখান থেকে একা ফিরতে পারব না।"

"এরকম অদ্ভুত কথাবার্তা আমাকে বলে বিরক্ত করবার চেষ্টা করবেন না।" রেগে গিয়ে বললেন নীলাদ্রীবাবু।

"না, মানে, আপনাদের বাড়িতে ভূত আছে?"

ছেলেটির এই সমস্ত অবান্তর কথা শুনে আরও চটে গেলেন নীলাদ্রীবাবু। একপ্রকার অস্থির হয়েই বললেন, "কেন? আপনি কি ভূত দেখেছেন নাকি! তারা কি আপনার দিকে তেড়ে আসছিল?"

ছেলেটির সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে দেখে নীলাদ্রীবাবু বুঝলেন সে সত্যি সত্যিই এমন কিছু দেখেছে যা অস্বাভাবিক। তবুও তিনি ছেলেটিকে বললেন, "কী দেখেছেন আপনি এমন যে এত ভয় পেয়ে গেছেন?"

ছেলেটি মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, "আপনি আগে খাবারটা ধরুন"

কথাটা বলেই ধপ করে দরজার সামনে বসে পড়ল ছেলেটি।

ছেলেটির এমন অবস্থা দেখে নীলাদ্রীবাবু তার দিকে একগ্লাস জল এগিয়ে দিলেন। গ্লাসের জলটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে দিলেন ছেলেটি। তার কিছুক্ষণ পরেই ছেলেটি আতঙ্কে ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। ভয়ে এবং আতঙ্কে তখনও তার গোটা শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। ছেলেটি এবার কোনোমতে দুটো কথা বলবার অবস্থায় এল।

"বিশ্বাস করুন আমি মিথ্যা কথা বলছিনা স্যার। আমি আপনাদের বাড়িতে কোনোদিন এর আগে আসিনি। আসবার সময়েই আমার গা'টা কেমন যেন ছমছম করছিল। যখন গেটটা খুলে ভিতরে ঢুকতে যাব এমন সময় দেখলাম দুটো ছায়া মানব আমার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথমে আমি টের পাইনি। কিন্তু ওরা আমাকে সজোরে এখান থেকে বের করে দিতে চাইল। আমাকে দু'বার গলা টিপে মেরে ফেলারও চেষ্টা করেছিল। আমি ভূতপ্রেতে খুব বিশ্বাস করি দাদা। আমি বেশ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি যে আমার সাথে কিছু একটা ঘটছে। তবুও আমি কোনোরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে আপনার বাড়ির

দোরগোড়ায় এসে পৌঁছাতে পেরেছি। নচেৎ হয়তো আজকেই আমার ইহজগতে শেষ দিন ছিল।" কথাগুলো বলেই হাঁপাতে লাগল সে।

ছেলেটির মুখে এইসব আজগুবি কথা শুনে নীলাদ্রীবাবুর মেজাজ ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তবুও তিনি কোনোরকমে নিজেকে সংযত রেখে বললেন, "শুনুন, আপনার এই সমস্ত আজগুবি কথা শোনার ইচ্ছে আমার নেই। এখন কী করতে হবে বলুন!"

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, আমি হয়তো এই পথে একা যেতে পারব না। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনি কি আমাকে একটু বাড়ির গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবেন?"

নীলাদ্রীবাবু কথা না বাড়িয়ে ছেলেটি যা বলছে তেমনটাই করলেন। ছেলেটি চোখের নিমেষে বাইকটি নিয়ে উধাও হয়ে গেল। সে চলে যেতেই নীলাদ্রীবাবু ঘরের দিকে ফিরতে লাগলেন। ফেরার পথে তাঁরও মনে হল কিছু একটা যেন তাঁর পিছন পিছন আসছে। অদৃশ্য অথচ তার উপস্থিতি বেশ স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি আর পিছনের দিকে না তাকিয়ে তাড়াহুড়ো করে বাড়িতে চলে এলেন। তবে মালতীর কথাগুলো হঠাৎ তার মনে পড়ল। সেও ঠিক এই ভাবেই বলত কারুর ছায়া দেখতে পায়। কখনো পুরুষের ছায়া আবার কখনো কোনো নারীর ছায়া। এমনটাও বলেছিল যে ছায়াগুলি নাকি অনিন্দিতার কণ্ঠস্বরে তার সাথে কথা বলত। এমনকী বাদবাকি কর্মচারীরা যারা কাজ ছেড়ে চলে গেছে তারাও একই কথা বলত। যার জন্য কেউই এই বাড়িতে বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। এছাড়াও আরেকটা বিষয় হল যারাই এই ছায়াদের দেখেছে বা কথোপকথন শুনেছে প্রত্যেকেই বলত ছায়াগুলি তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে। এর কিছুদিনের মধ্যেই সেই পরিচারক বা পরিচারিকা আত্মহত্যা করে মারা যেত। কিন্তু এই দুই ডাক্তার তো এরকম কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হননি কোনোদিন, তাহলে তাঁরাও কেন আত্মঘাতী হলেন?

নীলাদ্রীবাবুর মাথায় একরাশ প্রশ্ন উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করল। তবে কি সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু মৈথিলী? নাকি কাকতালীয়? এর পিছনে কি আরও বড় কোনো জটিল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে? অদ্ভুত বিষয়টি হল এই বাড়িতে তিনি এবং মৈথিলীও থাকেন। তবে তাদের কোনো বিপদ হয় না কেন? বেশিরভাগ বিপদ হয় এই পরিবারে বাইরে থেকে আসেন যারা তাদের। এটা কি সত্যিই সম্ভব! একি তবে অলৌকিক কোনো ঘটনার ছায়া? এইসব চিন্তা করতে করতে নীলাদ্রীবাবুর মনেও ভয় ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছিল।

বারো

নীলাদ্রীবাবু ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলেন। তিনি দেখলেন মৈথিলীর শরীরটা শূন্যে ভাসছে। অথচ সে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে রয়েছে। ভয়ঙ্কর সমস্ত আওয়াজে গোটা ঘরটা আন্দোলিত হচ্ছিল। তিনি নিজের চোখে দেখেই বিষয়টা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি 'মৈথিলী' - বলে চিৎকার করে তাকে ধরতে গেলেন, মৈথিলীর শরীরটা এসে পড়ল মেঝের উপরে। কেউ যেন তার গোটা শরীরটার সঙ্গে খেলা করে চলেছে। মনে হচ্ছিল কোনো অশরীরী প্রবেশ করেছে তার শরীরে। নিজের মেয়েকে তিনি নিজেই চিনতে পারছিলেন না।

কানে হাত দিয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ পর পরিবেশটি শান্ত হল। মৈথিলীর শরীরটা তখন উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে মেঝের উপরে। নীলাদ্রীবাবু অবাক হলেন। মেয়েটির শরীরের উপর দিয়ে এত ঝড় বয়ে যাবার পরেও মৈথিলীর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই কেন! এটা কী করে সম্ভব!

এখন পরিবেশ শান্ত। মৈথিলীর গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলেন তিনি। গা একেবারে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। পুরো চেহারায় ক্লান্তি আর দুর্বলতার ছাপ। কিছুক্ষণ আগেও মেয়েটি সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল! হঠাৎ কী হল?

সারারাত মৈথিলীর কপালে জলপট্টি দিলেন তিনি। রাতের খাবার পড়েই রইল। মুখে কাটতে পারলেন না কিছুই। রাতে কয়েকবার স্পঞ্জ করে দিলেন মৈথিলীর গোটা শরীরে। বেশ কয়েকবার মাথাও ধুয়ে দিলেন। তবুও জ্বর কমল না। মৈথিলী মাঝে মাঝে চোখ খুললেও কোনো কথা বলতে পারল না।

পরেরদিন সকালে জ্বর কিছুটা কমল। জ্বর কমলেও শুরু হল দুর্দান্ত পেটে ব্যথা। তার পেটের ভেতর থেকে কিছু একটা নাকি তাকে খোঁচাচ্ছে। নীলাদ্রীবাবু আর দেরি না করে মৈথিলীকে পাশের ক্লিনিকে নিয়ে গেলেন। কপাল জোরে একজন ভালো গাইনোকোলজিস্টকে পেয়ে গেলেন। দিনটি ছিল শনিবার। এই দিনটিতেই নাকি তিনি এই ক্লিনিকে বসেন। গাইনোকোলজি ডিপার্টমেন্টে মহিলা ডাক্তারটির নাম ডাক ছিল। ওঁর নাম ডক্টর সুহাসিনী বন্দোপাধ্যায়।

মৈথিলীর এমন অবস্থা দেখেই ডাক্তার ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন। মেয়েটির পেটে ব্যথা দেখে তিনি সিটি স্ক্যান এবং আলট্রাসোনোগ্রাফি করালেন। নীলাদ্রীবাবু পূর্বের কোনো রিপোর্ট সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাননি। সুযোগ পাননি বললে ভুল হবে, আসলে তিনি নিয়ে যেতে চাননি। পরীক্ষা করানোর পর রিপোর্ট দেখে সুহাসিনী দেবীও, ডক্টর কাপাস এবং ডক্টর রূপক হালদারের মতোই হতভম্ব হয়ে রইলেন।

তিনি বললেন, "ও মাই গড! এটা কীভাবে সম্ভব? একটা বাচ্চা মেয়ের গর্ভে ছয় মাসের বাচ্চা!"

নীলাদ্রীবাবু রেগেই বললেন, "আপনাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই তাই তো?"

সুহাসিনী দেবী অবাক হলেন না। এই প্রথম নীলাদ্রিবাবু কোনো ডাক্তারকে কথাগুলি শুনে বা জেনেও অবাক হতে দেখলেন না। তিনি শান্ত সুরেই নীলাদ্রিবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর ব্যাখ্যা আছে। তবে আপনার মেয়ের সাথে এগজ্যাক্টলি এই ঘটনাটি ঘটেছে কিনা তা বলাটা একটু কঠিন। মেডিক্যাল সায়েন্সে এই ঘটনাকে 'ফিটাস ইন ফিটু' বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে মায়ের গর্ভে যমজ সন্তানের একটি ভ্রূণের ভেতর অপর একটি ভ্রূণের বিকাশ ঘটে। পরবর্তীতে সেই প্রথম জন্মানো বাচ্চাটির গর্ভে দ্বিতীয় ভ্রূণটি পাওয়া যায়। এটি একটি বিরল ঘটনা। প্রায় পাঁচ লক্ষ শিশুর ভিতর একজনের সাথে হয়ত এমনটা ঘটে। তবে আট বছর বয়সে এসে এমনটা হয় বলে আমার জানা নেই। যদি এমনটাই হত তাহলে অনেক আগে থেকেই বিষয়টি ধরা পড়ত, কারণ পেটের ভিতর এত বড় ভ্রুণ থাকলে, শরীরের বাইরেও সেটির জানান দেওয়ার কথা। কিন্তু মৈথিলীর পেট দেখে তো তেমন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যত শীঘ্র সম্ভব বিষয়টি আমাদের গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে এবং তার জন্য অপারেশন করাটা খুব প্রয়োজনীয়। তবে তার আগে মৈথিলীর জন্ম এবং তার মা সম্পর্কে আমার কিছু জানতে হবে।

সুহাসিনী দেবীর কথাগুলি শুনে নীলাদ্রিবাবু চমকে উঠলেন। এখন তিনি বেশ কিছুটা অলৌকিকতার পরিচয় পাচ্ছেন। এতগুলো মানুষ কখনো একই কথা বলতে পারে না সকলের সমীক্ষা কখনোই এতবার ভুল প্রমাণিত হতে পারে না। দুজন ডাক্তার অপারেশন করতে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন। এখন এই মহিলা ডাক্তারেরও যদি একই অবস্থা হয় তাহলে! কিন্তু এমতাবস্থায় কথাগুলি এড়িয়ে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে এটুকু তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন মৈথিলীর সঙ্গে যা ঘটেছে বা ঘটে চলেছে তার কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা নেই কারোর কাছে। তাই তিনি ডাক্তারকে বললেন, এই বিষয়ে তিনি পরে কথা বলবেন। সুহাসিনী দেবীর ভিজিটের টাকাটি মিটিয়ে দিয়ে মৈথিলীকে নিয়ে তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন।

এর তিনদিন পর মৈথিলী আবার বেশ সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠল। রাত ভোর জেগে তিনি মৈথিলীর সেবা করে গেছেন একটানা তিনদিন ধরে। জ্বর প্রায় কমে এসেছে। শরীরও আবার আগের মতো আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নীলাদ্রীবাবু কিছুতেই চিন্তামুক্ত হতে পারছেন না। তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন মেয়েটা কিছুদিন পর ঠিক একইভাবে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে। পৃথিবীর কোনো ডাক্তারেরই সাধ্যি নেই তাকে এই অলৌকিক রোগের হাত থেকে রক্ষা করার। এর থেকে পালিয়ে বাঁচার সত্যিই কি কোনো উপায় আছে? এই রহস্যের শেষ কোথায়? মৈথিলী কি আর কোনোদিন সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে পারবে না? এই ভয়ংকর রোগ কি তাকে ছাড়বে না?

আজ যদি অনিন্দিতা বেঁচে থাকত তার জায়গায়, তাহলে এই পরিস্থিতিতে সে কি করত? আচ্ছা অনিন্দিতা কেনই বা আত্মহত্যা করতে গেল? সেও কি তাহলে মৈথিলীর আসন্ন বিপদের বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিল? সেই জন্যই কি সে তাকে সাহায্য করতে চাইছিল আর কোনো এক অজানা অলৌকিক শক্তি তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল?

হে ঈশ্বর! এত প্রশ্ন মাথার ভিতরে ঘা মারছে যার উত্তর আমার কাছে নেই। একমাত্র ঈশ্বরই পারেন এই দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান করতে, পথ দেখাতে।

অনেক ভাবনা চিন্তা করবার পর নীলাদ্রিবাবু যেন কিছুটা স্বস্তি পেলেন। তার মনে হতে লাগল কোথাও না কোথাও তিনি এই ঘটনাগুলির যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। তিনি খুব ভালোভাবে স্মরণ করে দেখলেন মৈথিলীর অসুস্থতা শুরু হয়েছিল তার মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই। এরপর থেকে কিছুদিন ঘনঘন রহস্যজনকভাবে তার অসুস্থ হওয়ার পেছনের কারণ যেন তিনি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। এসব যেন একটা সহজ সমীকরণের মতো তার সামনে উপস্থিত হচ্ছে। এই বিষয়গুলি তাহলে এতদিন তার মাথায় আসেনি কেন? এই আকস্মিক মৃত্যুগুলি কি তাহলে নতুন কোনো সন্দেহের বীজ বয়ে নিয়ে এসেছে? চোখের সামনে নিরাপরাধ মানুষগুলি একের পর এক আকস্মিক ভাবে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেল। যেমন অনিন্দিতাও একদিন হঠাৎই তাকে ছেড়ে চলে গেছিল।

অনিন্দিতা মারা যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর থেকেই তার বাড়ির কাজের লোকেরা সেই কালো ছায়া দেখে ভয় পেয়ে একে একে এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিল। কিন্তু মৈথিলী সেইসময় সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। কাজের লোকেরা চলে যাওয়ার পর বেশ কয়েক মাস কেটে যায় এই বাড়িতে। চারিদিকে পরিবেশ পরিস্থিতি যথেষ্ট শান্ত ছিল। তিনি এবং মৈথিলী এই বাড়িতে একাই থাকতেন। অনিন্দিতা মারা যাওয়ার বছর খানেক পরে তিনি একজন কাজের মহিলাকে এই বাড়িতে রাখেন। তখনই প্রথমবারের মতো মৈথিলী এই রকম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সেই কাজের মহিলাটির কাছ থেকেই তিনি কালো ছায়াগুলির বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন। মহিলাটি বেশি দিন পর্যন্ত এই বাড়িতে কাজ করতে পারেননি। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই মৈথিলী আবার পুনরায় সুস্থ হয়ে যায়।

এরপর মৈথিলীকে প্রাইভেট টিউশন দেওয়ার জন্য একজন মহিলা শিক্ষিকাকে তিনি বাড়িতে ডেকে ছিলেন। সেই শিক্ষিকা মৈথিলীকে পড়াতে পড়াতে ঠিক এরকমই ভয়ঙ্কর কিছু ছায়ার অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। শিক্ষিকাটি পরপর কয়েকদিন এই বাড়িতে মৈথিলীকে পড়াতে আসার পরেই সে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমন ঘটনার পরে শিক্ষিকাটি কয়েকদিন পড়াতে আসেননি। অদ্ভুতভাবে ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় মৈথিলী পুনরায় সুস্থ হয়ে যায়। তবে সেই শিক্ষিকাটি কেন এই বাড়িতে আর পড়াতে আসতে চাননি তা নীলাদ্রীবাবু জানতেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি তার সমস্ত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁরা কেউই এই বাড়িতে আর পা রাখতেন না। এ ছাড়া অন্য কোনো নারীর সঙ্গে তাঁর কোনো জানাশোনাও নেই যে তারা এই বাড়িতে আসবেন। তাহলে হঠাৎ হঠাৎ কোনো নারী এই বাড়িতে উপস্থিত হওয়া মাত্রই মৈথিলীর এই অস্বাভাবিক অসুস্থতা দেখা যেত কেন? ঠিক এই সময়ে নীলাদ্রীবাবু বেশ উত্তেজনা অনুভব করছিলেন। সমস্যাটা যেন তিনি কিছুটা হলেও বুঝতে পারছেন। এতদিন কেন এই কথাগুলি তার মাথায় এল না? কোনো কোনো সময় পাশের বাড়ির কোনো মহিলা এই বাড়িতে আসার ফলেও মৈথিলী একইভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ত।

সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল কোনো মেয়েমানুষ যে এই বাড়িতে এলেই শুধুমাত্র মৈথিলী অসুস্থ হয়ে পড়ত তা নয়। তিনি বহু পুরুষ পরিচারককেও এই বাড়িতে কাজের জন্য রেখেছিলেন। তবে পুরুষ মানুষেরা ভয় পেয়ে শুধু এই বাড়ি পরিত্যাগ করে চলে গেছে কিন্তু মহিলাগুলি সব থেকে বেশি ভয় পেত। তাদেরকেই কারা যেন প্রাণে মারতে চাইত। নীলাদ্রীবাবু ভালোভাবে ভেবে দেখলেন কোনো মহিলা এই বাড়িতে পা রেখেছেন আর মৈথিলী অসুস্থ হয়নি এমনটা কখনো ঘটেনি। তাহলে আসল জটিলতাটা কোথায়?

কিছুদিন আগেই নীলাদ্রিবাবুর এক বন্ধু সস্ত্রীক তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন মৈথিলীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরা হয়তো দু-তিন ঘন্টার জন্য এই বাড়িতে এসেছিলেন। ভদ্রলোকটি নীলাদ্রিবাবুর সঙ্গেই ছিলেন। মৈথিলী ওঁর স্ত্রী-এর কাছে ছিল। তারা বেশ কিছুক্ষণ খুব ভালোভাবেই আলাপ-আলোচনা করছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে হঠাৎ ঐ মহিলাটি চিৎকার করে উঠলেন।

মৈথিলী নাকি তাকে দেখে ভয়ঙ্কর আওয়াজ বার করছিল মুখ দিয়ে। নীলাদ্রীবাবু সেই আওয়াজ শুনে তৎক্ষণাৎ ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি এসে দেখেন মৈথিলীর হাত পা বেঁকে গেছে এবং মুখ দিয়ে গাঁজা বেরচ্ছে। মহিলাটি অত্যাধিক ভয় পেয়ে যান। সেদিনই প্রথম মৈথিলীর কণ্ঠে তিনি একটি পুরুষকণ্ঠের আওয়াজ ধ্বনিত হতে শুনেছিলেন। কোনো একজন পুরুষ মানুষ যেন মৈথিলীর ভিতর থেকে বলে উঠছিল, "এই মেয়ে সন্তানটিকে এখান থেকে সরাও। না হলে আমি একে শেষ করে দেব। এক্ষুনি তোমরা এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। তা নাহলে আজই তোমাদের প্রাণ যাবে।"

এরপর সেই দম্পতি আর এই বাড়িতে এক মিনিটের জন্যও ছিলেন না। এরকম বহু ঘটনার সাক্ষী ছিলেন নীলাদ্রীবাবু। তবে ওঁর খালি এটাই মনে হচ্ছিল যে এই মহিলাটির কাছে থাকার ফলেই মৈথিলীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে কোনো মহিলা বা মেয়ের সান্নিধ্যে আসার পরেই মৈথিলীর অবস্থার অধঃপতন ঘটেছে। অর্থাৎ এই বাড়িতে কোনো নারী যখন প্রবেশ করেন তখন সেই নারীর কোনো ক্ষতি হতে দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ মৈথিলী অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোনো নারীর এই বাড়িতে প্রবেশের সঙ্গে মৈথিলীর অসুস্থতার কী সম্পর্ক থাকতে পারে? নীলাদ্রিবাবুর মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। এর থেকে মুক্তির উপায় কী? আর মৈথিলীর গর্ভস্থ সেই বাচ্চার রহস্যটাই বা কী? এরও কোনো উত্তর তাঁর জানা নেই। প্রকৃতপক্ষে জানার উপায়টাও তাঁর জানা নেই।

সেদিন রাতটাও দু'চোখের পাতা বুজতে পারলেন না নীলাদ্রীবাবু। পরেরদিন সকালে মৈথিলী ঘুম থেকে উঠে বিছানা থেকে নিচে নেমে তার কাছে এল। তখন তাকে একেবারে সুস্থ এবং স্বাভাবিক একটা মেয়ে মনে হচ্ছিল। কত সুন্দর একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে, যার চোখ ভরা স্বপ্ন, বাঁচার ইচ্ছা, নতুন করে জীবনকে জানার ও চেনার তাগিদ। কে বলবে এই মেয়ে গত তিন দিন ভয়ঙ্কর অসুস্থ ছিল।

কিন্তু হঠাৎ করেই নীলাদ্রিবাবুর চোখের সামনে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল মৈথিলী। তিনি আতঙ্কে উঠে তাকে ধরলেন। এতক্ষণ তো দিব্যি সুস্থ ও স্বাভাবিকই মনে হচ্ছিল

তাকে তাহলে আবার কী হল? মেয়ের গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলেন তিনি। জ্বর তো একটুও কমেনি, সেই আগের মতোই, তবে গা পুড়ে যাচ্ছে। কিছু বলার আগেই নেতিয়ে পড়ল মৈথিলী তার কোলে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল। আবার কি কোনো নতুন ঝড়ের সংকেত? তাহলে কি ডক্টর সুহাসিনী দেবীও আত্মহত্যা করেছেন? ভয়েতে তার বুকটা কেঁপে উঠল। কবে শেষ হবে এই রহস্যের? কী আছে মৈথিলীর জীবনে? এর শেষ কোথায়?

তেরো

মৈথিলীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নীলাদ্রীবাবু দরজা খুললেন। দরজা খোলা মাত্রই তিনি বেশ অবাক হলেন। ডক্টর সুহাসিনি এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর দরজায়। হঠাৎ এমন অসময়ে তিনি নিজের কাজ ফেলে তার বাড়িতে এসেছেন, বিষয়টা খুব একটা স্বাভাবিক চোখে দেখলেন না নীলাদ্রীবাবু। একজন শিক্ষিত ও সুন্দরী ভদ্রমহিলাকে এভাবে বাড়ির বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখাটাও অসম্মানজনক। তাই তিনি সুহাসিনী দেবীকে ড্রয়িংরুমে এসে বসতে বললেন। নীলাদ্রীবাবু ভাবলেন অপারেশনের বিষয়ে হয়তো কোনো কথা বলতে এসেছেন তিনি। কিন্তু নীলাদ্রিবাবু চান না মৈথিলীর আর কোনো অপারেশন হোক। তিনি সুহাসিনী দেবীকে বললেন,

"আপনি কি অপারেশনের বিষয়ে আমার সাথে কোনো কথা বলতে এসেছেন? তাহলে আপনি চলে যেতে পারেন। আমি আমার মেয়ের আর কোনো অপারেশন করাব না।"

সুহাসিনী দেবী চমকে উঠলেন না। বরং তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, "অপারেশন করিয়ে কোনো লাভ নেই মিস্টার নীলাদ্রি। আপনার মেয়ের 'ফিটাস ইন ফিটু' বা এই ধরণের কোনো রোগ নেই। তার সমস্যা অন্য জায়গায়।"

নীলাদ্রীবাবু এতক্ষণ মহিলাটির কথায় বিরক্তি অনুভব করলেও এই কথাটি শোনা মাত্রই তাঁর উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে গেল।

"তাহলে সমস্যাটা কোথায়?" মনে মনে তাঁর সন্দেহটা আরো বাড়তে লাগলো। তাহলে কি কোনো অলৌকিক সত্ত্বা কাজ করছে এর পিছনে? যে বিষয়টি নিয়ে তিনি ভয় পাচ্ছেন সেটিই কি আসলে সত্যি?

সুহাসিনী দেবী বললেন, "আমি একজন গাইনোকোলজিস্ট। আমি আমার জীবনে বহু ক্রিটিকাল কেস দেখেছি। তার সাথে মোকাবিলাও করেছি। এমন কী বলতে পারেন বিজয়ীও হয়েছি। কিন্তু এবার আমার ভয়ের জায়গাটা অন্য কোথাও। যতটা স্বাভাবিক এই বিষয়টিকে দেখে মনে হয় ততটাই বেশি জটিল এটি। মেডিক্যাল সায়েন্সে এর উত্তর কোনোদিনই আপনি পাবেন না। তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে এত বছর যুক্ত থাকার পরেও আমি এর কোনো উত্তর খুঁজে পাইনি। গতকাল গোটা রাত আমি বিভিন্ন রকমের বই খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি তবে উত্তর মেলেনি। আমার আজকে এখানে আসার কারণ অন্য। হয়তো শুনলে আপনিও অবাক হবেন কিন্তু বিষয়টি স্বাভাবিক নয়। আপনার মেয়ের গর্ভে একটি ভ্রূণ আছে ঠিকই কিন্তু সেই ভ্রূণের অস্তিত্ব তার শরীরের বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে না। আমার ধারণা মৈথিলীর অপারেশন করেও তার গর্ভে কোনো ভ্রূণের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। কারণ তার গর্ভে যে ভ্রূণটি রয়েছে সে এই পৃথিবীর নয়। তার অস্তিত্ব মানব জগতের সাথে নয়।"

কথাগুলি শুনেই নীলাদ্রিবাবুর অযৌক্তিক মনে হল।

"কিছু মনে করবেন না তবে এই সমস্ত কথা শোনবার মতো অবকাশ আমার নেই। আমি অনেক রকম যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে রয়েছি। কাজেই আর আমার যন্ত্রণা বাড়াবেন না। এটাই অনুরোধ রইল আপনার কাছে।"

ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে কথাগুলি বললেন নীলাদ্রীবাবু।

তার কথার উত্তরে সুহাসিনী দেবী বললেন, "আমি জানি একজন ডাক্তারের মুখে এই ধরনের কথা শোভা পায় না। একজন ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও আমি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না দিয়ে অলৌকিক ব্যাখ্যা দিচ্ছি। দেখুন আলট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে পাওয়া আপনার মেয়ের গর্ভের সেই ভ্রূণের রিপোর্ট আমি এই ক'দিন ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখেছি। ভ্রূণটা সম্পূর্ণ মানুষের মতো দেখতে হলেও এর হাত এবং পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা চার। যেখানে সাধারণ মানুষের হাত এবং পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা হওয়া উচিৎ পাঁচটি। এছাড়া তার পায়ের চেটোতে এবং হাতের তালুতে অদ্ভুত একটি চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এটি কোনো সাধারণ চিহ্ন নয়। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলি, এই চিহ্নটি শয়তানের চিহ্ন; শয়তানি শাসনের প্রতীক বলতে পারেন।"

"আপনি একজন ডাক্তার হয়ে এই ধরনের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন! এটি আমি কল্পনাও করতে পারছি না সুহাসিনী দেবী। আমি আপনার আগে আরো দুজন বড় বড় ডাক্তারকে দেখিয়েছি। তাঁরা আপনার চেয়ে অনেক বড় ডাক্তার। এক্সপিরিয়েন্স এবং বুদ্ধিমত্তার দিক থেকেও তাঁরা ছিলেন অনেকখানি এগিয়ে। তাঁরা ওই ধরনের কোনো অদ্ভুত অস্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেননি। তবে এটা ঠিক যে রিপোর্ট দেখার পরে সবাই মৈথিলীর পেটে এই ধরনের উপস্থিতির কথাই আমাকে বলেছিলেন। কিন্তু এর সাথে কোনো শয়তান বা শয়তানী জগতের সম্পর্ক জড়িয়ে থাকতে পারে বলে তারা মন্তব্য করেননি। আমি আপনার মুখে এই কথাগুলো শুনে সত্যিই অবাক হচ্ছি। এত অদ্ভুত কথা কীভাবেই বা বলতে পারেন আপনি?"

একপ্রকার বিরক্তির সুরেই কথাগুলি বললেন নীলাদ্রীবাবু।

সুহাসিনী দেবী বললেন, "ফিটাস ইন ফিটু, রোগ নিঃসন্দেহে নয় এটি। কারণ এই রোগের অনেকগুলি লক্ষণ আছে যা আপনার মেয়ের শরীরে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই হয়তো সেই ডাক্তারেরা এই বিষয়ে আপনাকে কিছুই জানাতে পারেননি। এছাড়া অধিকাংশ ডাক্তারই প্যারানরমাল ঘটনায় বিশ্বাসী নন। আমিও একসময় এইসব বিষয়ে বিশ্বাস করতাম না। আমার জীবনে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটার পর থেকে আমি এগুলি বিশ্বাস করতে বাধ্য হই। এই শক্তির যে কত ক্ষমতা রয়েছে তা আমি সেদিনই টের পেয়েছিলাম। এই বিষয়গুলি অবিশ্বাস করে হেলায় উড়িয়ে দেওয়ার কারণে আমি আমার মেয়েকে চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলেছি।"

"ঘটনাটি ঘটেছিল আজ থেকে পাঁচ বছর আগে। আমি এবং আমার স্বামী আমাদের মেয়েটিকে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছিলাম। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে আমার স্বামী গাড়িটি খুব জোরেই ড্রাইভ করছিলেন। আমার মেয়ের পেটে হুবহু এরকমই একটি চিহ্ন ছিল, ঠিক যেরকম চিহ্ন মৈথিলীর শরীরেও রয়েছে। রাস্তায় একজন ফাদারের সাথে আমাদের দেখা হয়। তিনি আমার মেয়েটিকে দেখে ভীতি প্রকাশ

করেছিলেন। তিনি বলেন এই মেয়েটি শয়তানের বংশধর, একে চার্চে রেখে যেতে। আমি তখন বাঁধা দিয়েছিলাম। আপনার মতো আমিও এই সমস্ত আজগুবি কথায় বিশ্বাস করিনি। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই আমার স্বামী গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান। আমারও শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই বাড়ির পরিবেশটি সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছিল। আমার মেয়ের মুখ দিয়ে এমন অদ্ভুত সমস্ত কথাবার্তা আমি শুনতাম যার সাথে এই জগতের কোনো সম্পর্কই নেই। রাতে বাড়ির মধ্যে দিয়ে কাদের যেন হাঁটাচলার আওয়াজ পেতাম। একদিন তো নিজের মেয়ের ঘরে গিয়ে দেখলাম সে যেন কাদের সাথে কথা বলছে। দেওয়ালে বেশ কয়েকটি ছায়া দেখতে পেলাম। আতঙ্কে আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। একদিন রাতে আমার স্বপ্নে শয়তান এল। সে এসে আমাকে বলল, এই মেয়েটি তাদের বংশধর। আমি যেন এই মেয়েটির দেখাশোনা ভালোভাবে করি। আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছিলাম। আমি এরপর সেই চার্চের ফাদারের সাথে দেখা করতে যাই। তাঁরা আমার মেয়ের উপর এক্সরসিজম করেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনায় আমি আমার মেয়েকে চিরজীবনের জন্য হারিয়ে ফেলি। তখন ফাদার আমাকে বলেছিলেন, কিছু শয়তানি শক্তি নাকি এমন রয়েছে যাদের সাথে মোকাবিলা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকী স্বয়ং ঈশ্বরও পারেন না। আমি জানিনা আপনার মেয়েও তেমন কোনো শয়তানের কবলে পড়েছে কিনা। যদি তাই-ই হয়ে থাকে তাহলে আপনি আমার মতো কোনো ভুল করতে যাবেন না। কারণ শয়তান যদি এই বিষয়টি একবার টের পায় তাহলে মৈথিলীকে আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেবে।"

কথাপ্রসঙ্গে নীলাদ্রীবাবু বললেন, "তাহলে আপনি বলতে চাইছেন আমার মেয়ের গর্ভে যে ভ্রূণটি রয়েছে সেটি শয়তানের? আপনি এতটা নিশ্চিত হলেন কীভাবে?"

সুহাসিনী দেবী বললেন, "একই বছরের মধ্যে আমি আমার স্বামী এবং মেয়েকে হারিয়ে ফেলেছি। এরপর আমি এই শক্তি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছি। তাই এই চিহ্নটি আমি চিনি। আপনার মেয়েকে আমি সাহায্য করতে চাই। আপনার মেয়ের পেটের ভিতরে যে ভ্রূণটি রয়েছে তার শরীরেও এই একই চিহ্ন রয়েছে। আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে তা ধরাও পড়েছে। তবে আমি নিশ্চিত না হয়ে আপনাকে এই কথাগুলি বলতে চাইনি। কিন্তু গতকাল আমি যা যা তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, তার থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে আপনার মেয়েও শয়তানের কবলে পড়েছে।"

"এই শয়তানি শক্তি কখন কাকে কীভাবে বেছে নেবে তা আপনার বা আমার দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়। হয়তো সেই জন্যই আপনার সাথে এতদিন ধরে যে সকল অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাগুলি ঘটেছে বা আপনি যে সমস্ত ঘটনাগুলির সাক্ষী থেকেছেন তার প্রমাণ আপনি পাননি। এমনকী আগামী দিনে যেসব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে চলেছে আপনার সাথে তাও আপনি বুঝতে পারছেন না। তবে আমি মৈথিলীর নৃশংস পরিণতি চাইনি। তাই আমি শুধুমাত্র ডাক্তারের তকমা লাগিয়ে চুপ করে থাকতে পারিনি। পারলে আমায় ক্ষমা করে দেবেন। মৈথিলীর শরীরে যে চিহ্নটি দেখা যাচ্ছে সেটি একটি ক্রস চিহ্নের মতো। ক্রসটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেটি কোনো সাধারণ ক্রসের মতো নয়। ভালোভাবে

দেখুন সেটির আকৃতি কিন্তু ভ্রূণের চেয়েও বেশি স্পষ্ট। কেউ যেন তার হাতের চেটো এবং পায়ের পাতায় ক্রসটি এঁকে দিয়েছে।"

কথাগুলি বিশ্বাস না হলেও নীলাদ্রিবাবু বললেন, "এই শয়তানের ভ্রূণটা মৈথিলীর পেটে এল কী করে? আপনার কী মনে হয়?"

সুহাসিনী দেবী বললেন, "সে এক বিরাট এবং জটিল ব্যাখ্যা। সংক্ষেপে বিষয়টা এরকম, শয়তানের একটি সহজাত প্রক্রিয়া রয়েছে এই পৃথিবীতে আসার। বিভিন্ন রকমের বিষয়ের মধ্যে মৈথিলীর বিষয়টিও একটি। যুগে যুগে শয়তান এই পৃথিবীতে আসে। তাদের এই পৃথিবীতে আগমনের অনেকগুলো উপায় রয়েছে। অধিকাংশ সময় শয়তানের উপাসকেরা তাদের দেহ এবং আত্মাকে শয়তানের কাছে উৎসর্গ করে এবং শয়তানকে আহ্বান করে। পরে শয়তান তাদের দেহে আশ্রয় নেয়। কিন্তু শয়তানি আত্মা এই কাজটি করে না। এরা মানুষের রূপেই কোনো এক নারীর শরীর থেকে জন্মায়। পৃথিবীতে তারা শিশু রূপে আসে। ধীরে ধীরে এরা বড় হয় আর তাদের শয়তানি শক্তি ফিরে পেতে থাকে। এই শয়তানগুলোর আত্মা প্রথমে পৃথিবীতে আসে দেহ ছাড়াই। পরে সে কোনো নারীর সাথে সঙ্গম করে আর সেই নারীর গর্ভ থেকে এসে আবার জন্ম নেয়।"

নীলাদ্রীবাবু বললেন, "আপনি বোঝাতে চাইছেন আমার মেয়ের সাথে কোনো এক শয়তানের আত্মা সঙ্গম করেছে? সেই কারণে মৈথিলীর শরীরে শয়তানের ভ্রুণ প্রবেশ করেছে?"

সুহাসিনী দেবী বললেন, "বিষয়টা অনেকটা সেরকমই। কথাগুলো শুনে আপনার হয়তো আমাকে পাগল বলে মনে হতে পারে, তবে এটাই সত্যি।"

নীলাদ্রীবাবু হাসলেন।

"আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে সুহাসিনী দেবী। শয়তানের যদি পৃথিবীতে আসারই হত তাহলে এত নারী থাকতে একটা বাচ্চা মেয়ের শরীরে তিনি আশ্রয় নেবেন কেন? মৈথিলীর বয়স যখন চার বছর তখন থেকেই সে এরকম অসুস্থ। আর আপনি এসব ভুলভাল কথা বোঝানোর চেষ্টা করছেন আমাকে?"

সুহাসিনী দেবী একটু চিন্তায় পড়লেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি বললেন, "আমিও সেটাই ভাবছি। শয়তানকে যদি আহ্বান না করা হয় তাহলে সে কখনো আসেনা। আপনার মেয়ে কী করে তাকে আহ্বান করল?"

নীলাদ্রীবাবু এবার উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, "দেখুন আমি আপনার কথা ধৈর্য ধরে শুনলাম। তবে এতক্ষণ আপনি যে বিষয়গুলি আমার সামনে তুলে ধরলেন বা আমার সাথে যে বিষয়গুলিকে নিয়ে তর্ক করবার চেষ্টা করলেন সেটি খুবই হাস্যকর। আপনি দয়া করে আমার বাড়ি থেকে চলে যান। এই সমস্ত কথাগুলি মৈথিলীর কানে গেলে সে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে।"

নীলাদ্রিবাবুর কথাগুলো শুনে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তবে যাওয়ার আগে বলে গেলেন :

"দয়া করে এই শক্তিকে তুচ্ছ করবেন না। যে কোনো সাহায্য লাগলে আমার কাছে আসতে পারেন। আপনার এই বাড়িতে যে অলৌকিক কিছু আছে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। আমি যখন এই বাড়িতে ঢুকছিলাম তখন কয়েকটি কালোছায়া আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল।"

কথাগুলি বলে ডক্টর সুহাসিনী চলে গেলেন। নীলাদ্রীবাবু বাড়ির গেট লাগিয়ে ড্রয়িংরুমে এসে কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে বসে রইলেন। মৈথিলীর সঙ্গে এবং এই বাড়িতে অলৌকিক কিছু যে একটা আছে তার অস্তিত্ব তিনি এখন অনেকটাই অনুমান করতে পারছেন। তবে এইসব হুজুগে কথা বিশ্বাস করার কোনো মানে হয় না বলেই তিনি নিজেকে আশ্বস্ত করলেন।

চোদ্দ

নীলাদ্রীবাবু একটি আওয়াজ শুনলেন। মৈথিলীর ঘর থেকেই আওয়াজটা এসেছে বলে তার মনে হল। তিনি দৌড়ে মৈথিলীর ঘরে গেলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাঁর হাত-পা কাঁপতে লাগল। এমন দৃশ্য যে জীবিত অবস্থায় ওঁকে কোনোদিন দেখতে হতে পারে এমনটা তিনি ভাবেননি। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। মৈথিলী বিছানা থেকে কয়েক ফুট উপরে উঠে শূন্যে ভাসছে। তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কেমন যেন বেঁকে গেছে। শরীরের আয়তন আগের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে। পা আর হাত দুটোকে দেওয়ালের সাথে আটকে ভেসে রয়েছে সে। মৈথিলীকে বাঁচাতে যেতেই সারা ঘর থরথর করে কাঁপতে লাগল। যেন কোনো শক্তি ভর করেছে মৈথিলীর উপরে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও তিনি ওর কাছে যেতে পারলেন না। ঘরের সমস্ত জিনিসগুলিকে মৈথিলী চিৎকার করে এদিক থেকে ওদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল।

একজন হাত বা পায়ের ব্যবহার না করেও কীভাবে ভারী ভারী জিনিস তুলে ফেলে দিতে পারে তা প্রথমবারের জন্য দেখলেন নীলাদ্রীবাবু। মৈথিলীর চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরিয়ে আসছিল। মৈথিলী তার চোখের ইশারায় একটা একটা করে বই বুক সেলফ থেকে মেঝেতে ফেলতে লাগল। কোনোটা আবার ছুঁড়ে দিল নীলাদ্রীবাবুর দিকে। নিজেকে কৌশলে রক্ষা করলেন তিনি। কিন্তু তারপরেও মৈথিলীর রাগ কমল না। সে একটি ফুলদানি উঠিয়ে নিল টেবিল থেকে। তারপর সেটিকে ছুঁড়ে মারল তাঁর দিকে। সেটি নীলাদ্রীবাবুর কপালে এসে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কপাল থেকে ঝরঝর করে রক্তের ফোঁটা পড়তে লাগল। সেটা দেখে বিকটভাবে হেসে উঠল মৈথিলী। পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল মৈথিলীর মুখ থেকে :

"শয়তানকে পৃথিবীতে আসতে কারোর পা ধরতে হয় না। সে এমনিতেই চলে আসে। তবে কেউ যদি ওকে আহ্বান করে পৃথিবীতে আনতে চায়, তাহলে কারোর সাধ্য নেই তাকে আটকায়। পথের কাঁটাকে কীভাবে সরাতে হয় তা শয়তানের ভালো জানা।"

এতটা বলেই কেউ যেন তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল। আকাশ বাতাস মুখরিত করে কিছু একটা যেন ঘরের শান্ত পরিবেশকে নিমেষের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করে দিল। নীলাদ্রীবাবু তখনও যন্ত্রণায় মেঝেতে শুয়ে ছটফট করছিলেন। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি জ্ঞান হারালেন। মুহূর্তেই তাঁর চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

যখন চোখ খুললেন তখন দেখলেন পুরো ঘর অন্ধকার। তিনি মেঝেতে পড়ে রয়েছেন। বিছানা থেকে মৈথিলীর গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে। তিনি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধকারের মধ্যে কোনো কিছুই দেখতে পেলেন না। দেওয়াল হাতড়ে তিনি কোনোরকমে ঘরের আলো জ্বালানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মাথায় এতটাই জোরে চোট লেগেছিল যে তিনি কিছুতেই

কাজটি করতে পারছিলেন না। বারবার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তার মনের জোর অটুট ছিল। তিনি দেখলেন সুইচ বোর্ডের সমস্ত সুইচ অন করা রয়েছে কিন্তু ঘরে কোনো বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই। এমনটাও যে দিনের আলোয় সম্ভব হয় তা তার জানা ছিল না! শয়তানের ক্ষমতা সত্যিই সাধারণ নয়। সুহাসিনী দেবীর কথাগুলোতে এখন বিশ্বাস হল তাঁর।

কোনোরকমে বারান্দায় এলেন নীলাদ্রীবাবু। মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত লাগার ফলে চোখে সবকিছু ঝাপসা দেখছিলেন তিনি। কোনোরকমে রান্নাঘর থেকে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে আবার মৈথিলীর ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি। মৈথিলী খাটের উপরে উপুড় হয়ে পড়েছিল। তার পেটের উপরে মোমের আলোটা ফেললেন তিনি। যা দেখলেন তাতে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাস সারা জীবনের মতো চলে গেল। চোখের নিমেষে মৈথিলীর পেটের অংশটি ফুলে উঠছে। পেট ফুলে একজন গর্ভবতী নারীর পেটের মতো আকার ধারণ করল। বিষয়টি দেখে ভয় পেয়ে নীলাদ্রিবাবুর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। হঠাৎ তিনি তাঁর পিছনে কোনো কিছুর উপস্থিতি অনুভব করতে পারলেন।

কেউ যেন তাঁকে সাবধান করতে এসেছে। পিছনে ফিরতেই মোমের আলোতে কয়েকটি ছায়া স্পষ্ট দেখতে পেলেন তিনি। সামনের দেওয়ালে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছায়াগুলি। একেবারে ডান দিকের ছায়াটি একটি নারীর। পাশের দুটি পুরুষের। পুরুষের ছায়াদুটি মুহূর্তের মধ্যে দেওয়ালের একটি অংশে মিলিয়ে গেল। নারীরূপী ছায়াটি ধীরে ধীরে নীলাদ্রিবাবুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তিনি পাথরের মূর্তির মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুহূর্তের মধ্যেই একটা দমকা হাওয়া প্রবেশ করল ঘরে আর সেই হাওয়ার বেগে তার হাতের মোমবাতিটা নিভে গেল বারান্দায় নিভন্ত বাল্বটির ফাটার শব্দও স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি। ঘরে আর একটিও আলো নেই। ঘরের দরজা জানলা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। নীলাদ্রিবাবুকে অবাক করে দিয়ে একটি চেনা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "কেমন আছ নীল?"

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন নীলাদ্রীবাবু!

"অনিন্দিতা তুমি! আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি তো কবেই মারা গেছ! তুমি কোথা থেকে এলে?"

অনিন্দিতা বলে উঠলেন, "আমি নিঃশেষিত হইনি। হয়েছিল শুধু আমার শরীরটা। এতগুলো বছর ধরে আমার আত্মা এই বাড়িতেই রয়েছে। ছায়া হয়ে আমি তোমাদের দুজনকে পাহারা দিয়ে গেছি এতগুলো বছর। তোমরা কেউ আমাকে দেখতে পাওনি কিন্তু আমি সবসময় তোমাদের সাথেই ছিলাম, আজও আছি এবং হয়তো আগামী দিনেও থাকব।"

নীলাদ্রীবাবু একটু রেগে গেলেন।

"তুমি যদি আমাদের পাশেই থাকো তাহলে মৈথিলীকে তুমি কেন এত বিপদে দেখেও সামলাওনি? আমি শুনেছি মানুষের হাতে যে ক্ষমতা থাকে না সেই ক্ষমতা নাকি অশরীরীদের হাতে থাকে। আর সেখানে তুমি ওর মা। তাই তোমার উচিৎ ছিল নিজের মেয়ের প্রাণ রক্ষা করা। কিন্তু তুমি তা করোনি।"

অনিন্দিতার কান্নার শব্দ ভেসে এল তার কানে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে চোখে দেখতে পারছিলেন না ঠিকই কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছিলেন বেশ ভালোভাবেই।

"হ্যাঁ, তুমিই দায়ী অনিন্দিতা। সবকিছুই তো খুব স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। মৈথিলী অসুস্থ হচ্ছিল আবার সুস্থও হয়ে যাচ্ছিল। তুমি আর তোমার ছায়াদের উপস্থিতি ওর শরীরের অবনতির কারণ।"

তখন নারীকণ্ঠটি বলে উঠল, "কখনোই তা নয়। তুমি কেন শুধু শুধু মৈথিলীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলে? তোমার জন্যই বেচারা ডাক্তার দুজন মারা গেলেন অকালে। রোগীকে দেখলেই অপারেশন করার বড় শখ জেগেছিল তাঁদের। কিন্তু শয়তানের ক্ষমতার কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। আর তোমার এই বাড়াবাড়ির কারণে মৈথিলীও আরো বেশি করে শাস্তি পাচ্ছে। শয়তানকে রাগাচ্ছ কেন তুমি?"

"এই শয়তানটা ঠিক কে আমাকে দয়া করে বলবে? ওঁকে না আমি দেখতে পাই, আর না আমি ওঁর কোনো কথা শুনতে পাই। তাই তোমার কাছে ওঁর অস্তিত্ব থাকলেও আমি ওঁর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নই।"

তখন নারীকণ্ঠটি আবার বলে উঠল, "মৈথিলীর গর্ভে যিনি রয়েছেন তিনিই শয়তান। সাধারণত শয়তান নিজেই পৃথিবীতে আসবার জন্য কারোর শরীর বা গর্ভ বেছে নেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্যে আহ্বান করা হয়েছিল তার শরীরে প্রবেশের অধিকার ছিল তাঁর। কিন্তু সে না থাকায় বাধ্য হয়ে শয়তানকে মৈথিলীর গর্ভে জায়গা করে নিতে হয়েছে।"

"হেঁয়ালি না করে পরিষ্কার করে বলো অনিন্দিতা, আমি তোমার কোনো কথাই বুঝতে পারছি না।"

নারীকণ্ঠটি আবার বলে উঠল, "আমার উপর বেশি চিৎকার কোরো না। মৃত্যুর পরে আমি আর শরীরে অবস্থান করিনা। তাই তুমিও আমার স্বামী নও আর মৈথিলীও এখন আমার মেয়ে নয়। তবে আমি এসেছি তোমাকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচাতে। এখন আমি শয়তানের অধীন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করি মাত্র।"

"তাঁর আদেশ পালনের জন্যই আমার আজ আবির্ভাব। মৈথিলী বা তোমার তিনি কোনো ক্ষতি করবেন না। কারণ মৈথিলীকে তুমি লালন-পালন করেছ। মৈথিলীর যখন সন্তান জন্মদানের বয়স হবে তখন ভ্রূণটা তার অস্তিত্ব আপনা থেকেই জানান দেবে। শয়তানই হবে মৈথিলীর পুত্র। ততদিন পর্যন্ত শয়তানকে মৈথিলীর গর্ভেই থাকতে দাও। শয়তান জন্মাবার পরেই একমাত্র মৈথিলী এবং তোমার মুক্তি ঘটবে। তার আগে তাঁকে রাগিও না। তুমিই বিপদে পড়বে।"

"তুমি এসব কী বলছ অনিন্দিতা! আমি মৈথিলীর পিতা হয়ে চুপচাপ এমনটা কী করে দেখে যাব? আমার মেয়ে জন্ম দেবে একটা শয়তানকে? এই শয়তানের ভ্রূণ আমার মেয়ের গর্ভে এল কী করে? ও তো শয়তানকে আহ্বান করেনি! তাহলে এই অভিশাপ তাকে কেন স্পর্শ করল?"

বেশ কিছুক্ষণ এই প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। তারপর আবার নারীকণ্ঠটি বলে উঠল, "মৈথিলীর জন্মের পর এবং পরবর্তী সন্তান জন্মাবার আগে পর্যন্ত এক দীর্ঘ সময় আমাকে একা থাকতে হয়েছিল। তোমার মা একজন পুত্র সন্তান আশা করেছিলেন। সেখানে আমার গর্ভে প্রথম

আসে মৈথিলী। মৈথিলীর জন্মের পর থেকেই উনি বারংবার আমাকে চাপ দিতে থাকেন পুনরায় সন্তান ধারণের জন্য। কারণ ওঁর স্থির বিশ্বাস ছিল এবার হয়তো পুত্রসন্তানই জন্মাবে। এই সমস্ত কিছুই ঘটত তোমার অবর্তমানে। তোমার সামনে হয়তো তিনি কোনোদিন আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি কিন্তু তোমার পিছনে আমাকে অনেক কটু কথা শোনাতেন।"

"আমি কোনোদিন তোমাকে মুখ ফুটে বলিনি। তোমার মায়ের চাপে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আমি পুনরায় সন্তান ধারণের কথা ভাবি। কিন্তু ডাক্তার আমাকে বলে দিয়েছিলেন আমার পক্ষে দ্বিতীয় সন্তান ধারণ করা আর সম্ভব নয়। তাতে আমার শরীরের ক্ষতি হতে পারে, এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তোমার মাকে বলার পরেও তিনি আমার কথায় কান দিলেন না। আমাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে দেওয়ার কথাও বললেন তিনি। ফলে আমি ভয় পেয়ে এমন একটি পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম যা তোমাদের সকলেরই অজানা। আমি গোপনে এক সাধুর সাথে দেখা করেছিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন আমি পুরোপুরি বন্ধ্যা নই। এখনো নাকি আমার সন্তান ধারণ সম্ভব। তিনি আমাকে একটি বাড়ির সন্ধান দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারি ওঁরা কালো যাদু চর্চা করেন। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব মূর্তি দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম। ওঁরা আমাকে বললেন, একটা কাজ করলে পুনরায় আমি সন্তানসম্ভবা হতে পারব। আমাকে নিজেকে শয়তানের কাছে উৎসর্গ করে দিতে হবে। আমার আত্মা বা দেহ শয়তান চান না। উনি শুধু আমার গর্ভের মাধ্যমে পৃথিবীতে আসতে চান। আমি যখন ওঁদের বললাম যে আমার সন্তান ধারণ আর সম্ভব নয়, তখন ওঁরা বললেন শয়তান যে কোনো পরিস্থিতিতেই মানুষের শরীরে জায়গা করে নিতে পারেন। ওঁরা আমাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। একটানা চার মাস ধরে আমাকে ওই মন্ত্রটি জপ করতে হয়েছিল। আমি নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য আর কোনো উপায় দেখতে পাইনি। ফলে আমি নিয়মিত এই মন্ত্রটি জপ করতে থাকি।"

"এর কিছুদিনের মধ্যেই আমি সন্তানসম্ভবা হয়ে যাই। একটা শয়তানকে আমি পৃথিবীতে আনব! যে কিনা ধ্বংস করতে চাইবে পৃথিবীর সৌন্দর্য! মনের মধ্যে হঠাৎ পাপবোধ জন্মাল আমার। নিজের ভুলটা বুঝতে পারলাম। সেই কালা জাদুর তান্ত্রিকেরাও তখন ভিক্ষুকের বেশে আমাকে প্রায়ই দেখে যেতেন। আমার ভয় লাগতে শুরু করল। সেইজন্যই আমি গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি রাজি হলে না। এই ঘটনাগুলো তোমার অজান্তে ঘটেছিল বলে আমি তোমায় খোলাখুলিভাবে কিছু বলতেও পারছিলাম না। তাই ভাবলাম তোমরা সুখে থাকো। আমার মৃত্যুর সাথে সাথে শয়তানও এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু আমার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হল। অপঘাতে মৃত্যুর ফলে আমি হলাম অভিশপ্ত ছায়া। আর সেই শয়তানটার ভ্রূণ অদৃশ্য আকার ধারণ করে মৈথিলীর গর্ভে আশ্রয় নিল। তাকেও করে দিল অভিশপ্ত। সেই তান্ত্রিকের দল ভেবেছিলেন আমার মৃত্যুর সাথে সাথে শয়তান হয়তো চলে গেছে। তাই তাঁরা এই বাড়িতে আর ফেরেননি। কিন্তু আমি জানি ঠিক কী হয়েছিল। শয়তানের ভ্রূণ মৈথিলীর গর্ভে প্রবেশ করেছিল। তার শুধু একটি গর্ভের প্রয়োজন ছিল। চোখের সামনে মৈথিলী থাকায় সে তার গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন। শয়তান যে কোনো আকারে,

যেকোনো প্রকৃতিতে, যে কোনো মেয়ের শরীরে প্রবেশ করতে পারেন। তাই মৈথিলীর বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও, ওর শরীরে শয়তানের প্রবেশ করতে কোনো অসুবিধা হয়নি।”

পনেরো

নীলাদ্রীবাবু কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "হে ঈশ্বর! আমার মায়ের জন্য তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও অনিন্দিতা। আমি সেখানে উপস্থিত থেকেও তোমাকে শান্তি দিতে পারিনি আর তাই আজও মৈথিলীর পিতা হওয়া সত্ত্বেও আমি ওকে শান্তি দিতে পারছি না। ঈশ্বর বোধহয় এই জন্যই আমার এত কঠিন পরীক্ষা নিচ্ছেন। কিন্তু এর হাত থেকে মুক্তির কি কোনো উপায় নেই? সারা জীবনের জন্য কি তাহলে আমরা শয়তানের কবলে বন্দি হয়ে থাকব? তুমি নিশ্চয়ই এর একটা কোনো উপায় বলে দিতে পারবে! দয়া করে আমাকে বলো কী করলে আমরা শয়তানের কবল থেকে উদ্ধার পাব?"

নারীকণ্ঠটি পুনরায় বলে উঠল, "তোমাকে যা বললাম তাই শোনো। এর থেকে বেশি কিছু ঘটাতে যেও না। তাহলে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হবে না। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেও যেও না। তাহলেই সব শেষ। যেদিন এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পাবে সেদিনই সব সমস্যার অন্ত ঘটবে। প্রথমে তুমি মারা যাবে আর তারপর তোমার মেয়ে মৈথিলী। তাই শয়তানকে রাগিও না। তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও। সব প্রশ্নের উত্তর জানা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। শয়তান তোমাকে তার যোগ্য মনে না করলে সেই উত্তর তিনি দেবেনও না। কথাটা মাথায় রেখো। তুমি শুধু এই বাড়িতে নারীর প্রবেশ বন্ধ করে দাও। আমি শুধু এই কথাগুলি তোমাকে জানাবার জন্যই এত বছর অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু শয়তানের অনুমতি ব্যতীত আমি কোনো কথাই তোমাকে বলতে পারতাম না। তাই আজকে সমস্ত কথা তোমাকে বলে দিয়ে আমি চিরদিনের মতো বিদায় নিচ্ছি।"

এরপরেই ঘরের পরিবেশ একেবারে শান্ত হয়ে গেল। ঘরের আলো আপনা আপনি জ্বলে উঠল। হঠাৎ নীলাদ্রিবাবুর চোখ পড়ল সামনের দেওয়ালের দিকে। সেখানে রক্ত দিয়ে লেখা ছিল, "শয়তানকে আসতে দাও, সে আসবেই। যে তাকে আসতে বাঁধা দেবে, তারই দুর্গতি।"

এমন সব ঘটনার সাক্ষী তাকে থাকতে হবে তা তিনি জীবনেও কল্পনা করতে পারেননি। ঘরের দরজা-জানলাগুলিও আপনা আপনি খুলে গেল। ঘর একেবারে লন্ডভন্ড। মৈথিলী শুয়ে আছে বিছানায়। তার পিঠের দিকের জামার অংশটি ছিঁড়ে গেছে। হঠাৎ সে উঠে বসল খাটের উপর। এখন তাকে দেখতে বেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক লাগছে। তিনি মৈথিলীকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। চোখ বন্ধ করে শুধু ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলেন, যাতে তিনি মৈথিলীর প্রাণ ভিক্ষা দেন।

এখন রহস্যটা অনেকটাই যেন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। অনিন্দিতা যাই বলুক না কেন তিনি কিছুতেই শয়তানকে পৃথিবীতে আসতে দেবেন না। শুধু তাই-ই নয়, নিজের মেয়েকেও এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবেন এমনটাই মনস্থির করলেন।

সুহাসিনী দেবীর কথাগুলির সঙ্গে অনিন্দিতার অনেক কথারই বেশ মিল ছিল। তার মাথায় সুহাসিনী দেবীর কথাগুলি ফের আঘাত করল। তিনি ভাবলেন এখন একমাত্র সুহাসিনী দেবীই তাকে এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। তাই তিনি সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করার মনস্থির করলেন। মৈথিলীকে খাইয়ে-দাইয়ে তিনি শুইয়ে দিলেন। এরপর অফিসের খুব কাছের এক বন্ধুকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন, ছেলেটির নাম অমল।

তিনি বললেন, "অমল আমি কিছুক্ষণের জন্য আমার মেয়েকে তোমার কাছে রেখে গেলাম। আমি একটি বিশেষ কাজে দু-এক ঘন্টার জন্য বাইরে যাচ্ছি। আজকে রবিবার, কাজেই আমার বাড়িতে দু'ঘণ্টা কাটাতে তোমার আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না? আসলে মৈথিলীর শরীরটা ঠিক নেই। এমতাবস্থায় বাড়িতে ওকে একা রেখে যাওয়াটাও ঠিক নয়। তাই আমি ভাবলাম তুমি যদি থাকো!"

অমল বিনম্র সুরে বললেন, "আমি আপনাকে নিজের দাদার চোখে দেখি। কাজেই আপনি নিশ্চিন্তে বাইরে যান।"

অমলের কাছে মৈথিলীকে রেখে দিয়ে অনেকটাই স্বস্তি বোধ করলেন নীলাদ্রীবাবু। এরপর তিনি সোজা চলে গেলেন ডক্টর সুহাসিনী দেবীর চেম্বারে। সেখানে পৌঁছেই আরও একবার স্তম্ভিত হলেন তিনি। ওখানে গিয়ে তিনি শুনতে পেলেন গতরাতে নাকি ডক্টর সুহাসিনী দেবী তাঁর নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করেছেন। ভয়েতে তাঁর সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল। তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়লেন।

আধ ঘন্টার মধ্যেই তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন ফিরে এসে যা দেখলেন তা তাঁর বিশ্বাস হল না। অমলের বুকের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মৈথিলী। তার হাতে একটি চাকু। একটু অসতর্ক হলেই হয়তো অমলের বুকে সেটা গেঁথে যাবে। কোনোরকমে মৈথিলীকে অন্যমনস্ক করতেই তার হাত থেকে চাকুটি পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। মৈথিলী প্রচণ্ড রেগে গেল। অমল সেটি দেখে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে সে। বারে বারে তার নাম ধরে চিৎকার করা সত্ত্বেও অমল আর ফিরে এল না। নীলাদ্রিবাবুর সমস্ত আশাভরসা প্রায় শেষ হতে বসেছিল। তিনি বুঝলেন শয়তানকে পৃথিবীতে না আনার কোনো পথই আর বোধহয় তার কাছে অবশিষ্ট নেই। এখন তিনিও শয়তানেরই দাসত্ব করতে বাধ্য।

তিনি ভাবলেন,আর তো মাত্র কয়েকটা বছর। মৈথিলী বড় হবে আর অবসান ঘটবে এই অভিশপ্ত জীবনের। হয়তো তখন পৃথিবী পড়বে চরম বিপদের মুখে। কিন্তু তাঁরা তো মুক্তি পাবেন। শুধু এটা খেয়াল রাখতে হবে যে তার আগে কোনো নারীর শরীর যাতে এই বাড়িতে প্রবেশ করতে না পারে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল বাড়ির বড় গেটটা তো খোলা রয়েছে। এখন যদি কোনো মহিলা বাড়িতে প্রবেশ করে তাহলে মৈথিলী তো আবার সেই ভয়ঙ্কর রূপে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নীলাদ্রিবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কলিংবেলটা পুনরায় বেজে উঠল।

"আবার কে এল?" মৈথিলীর দিকে চমকে তাকালেন তিনি। মৈথিলী তখন সুস্থ এবং স্বাভাবিক ছিল। কিছুক্ষণ আগেই অমলের সঙ্গে যে ঘটনাটি ঘটল তারপরে মৈথিলী কীভাবে এতটা সুস্থ আচরণ

করতে পারে দেখে তিনি প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেলেন। তবে বুঝতে পারলেন যার শরীরে শয়তান প্রবেশ করেছে, তার দ্বারা কোনো কাজ অসম্ভব হতে পারে না। মৈথিলী তখন পুতুল নিয়ে খেলছিল।

তিনি ধীরগতিতে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। দরজা খুলতেই তিনি দেখলেন বাইরে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চেহারা ছবি দেখে মনে হল তিনি একজন ফাদার। তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, "আমার নাম ফাদার জর্জ। আমি শহরের বাইরে ছিলাম। সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চের সেবায় নিযুক্ত আমি আজ প্রায় পনেরো বছর।"

"বেশ তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। তাছাড়া আপনিই বা আমাকে চিনলেন কী করে?"

ষোলো

লোকটি কী উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর বাড়িতে এসেছেন এই বিষয়টি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না নীলাদ্রীবাবু। লোকটি বিনা অনুমতিতেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ড্রইংরুমে গিয়ে একটি চেয়ারে বসলেন। তারপর শান্ত স্বরে বললেন,

"এক গ্লাস জল পেতে পারি?"

গ্লাসের জলটা শেষ করেই লোকটি বললেন, "আপনার মেয়ের সাথে যা যা ঘটছে তার সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। কিছুদিন আগে ডক্টর সুহাসিনীর সাথে নিশ্চয়ই আপনার যোগাযোগ হয়েছিল! ওঁর সাথে আমার বহুদিনের পরিচয়। ওঁর জীবনেও ঠিক এরকম ঘটনা ঘটেছিল। আমি ওঁকে হাজারবার বারণ করা সত্ত্বেও উনি আমার কথায় বিশ্বাস করেননি। ওঁর স্বামী এবং মেয়েকে কেড়ে নিয়েছিল এই শয়তান। আপনি এসব জানেন বোধহয়?"

নীলাদ্রিবাবুর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। ভয়ে তাঁর চোখ-মুখ ছোট হয়ে এল। এই লোকটি ডক্টর সুহাসিনীর কথা বলছেন কেন? তাহলে কি লোকটা সবকিছু জেনে গেল? মৈথিলীর কারণেই যে এই তিনজন ডাক্তার আত্মহত্যা করেছেন এটাও হয়তো তিনি বুঝে যাবেন বা গেছেন। শহরের সকলের মধ্যে যদি এই বিষয়টি এখন জানাজানি হয়ে যায় তাহলে তাঁর পক্ষে এই শহরে থাকা আর সম্ভব হবেনা। এমনকী বিষয়টা পুলিশের কানে গেলে হয়তো তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।"

কিছুক্ষণ বাদে লোকটি বলে উঠলেন, "ডক্টর সুহাসিনী আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন।"

"ডক্টর সুহাসিনী আপনাকে হঠাৎ এখানে আসতে বলবেন কেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁকে আমি অনেক বছর আগেই চিনি। সুহাসিনী নিজের উন্নতির স্বার্থে একজন সাধকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। সেই সাধক না বুঝেই শয়তানকে আহ্বান করেছিলেন। আর এর কুপ্রভাব পড়েছিল সুহাসিনীর সংসারে। প্রথমদিকে বিষয়টিকে খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিলেন সুহাসিনী। ফলে তিনি তাঁর স্বামীকে হারালেন। তারপর সেই শয়তানের আত্মা প্রবেশ করল তাঁর মেয়ের শরীরে। এই পৃথিবীতে অজেয় অমর হয়ে থাকবার জন্য কোনো না কোনো শরীরের প্রয়োজন শয়তানের হয়েই থাকে। তারপর একদিন অকালে তাঁর মেয়েটিও প্রাণ হারাল। সুহাসিনীও কিছুই করতে পারেননি। চুপচাপ এই মৃত্যু-যজ্ঞ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছিল তাঁকে। গতকাল আপনার সাথে তার কী কী কথা হয়েছিল তাও তিনি রাতে আমাকে জানিয়েছিলেন। আমিও এমনটাই অনুমান করি আপনাদের বাড়িতে শয়তানের অস্তিত্ব আছে। আজকে সকালে যখন সুহাসিনীর সাথে দেখা করতে আসলাম, তখন জানতে পারলাম তিনি আত্মহত্যা করেছেন। এটা যে কোনো সাধারণ মৃত্যু না তা আমি বেশ ভালোই বুঝতে পারছি। এর পিছনে রয়েছে শয়তানি চক্রান্ত। তিনি আমাকে দু'দিন

আগেই ফোনে আপনার কথা বলেছিলেম এবং আপনার ঠিকানাও দিয়ে দিয়েছিলেন। শহরে ফিরলেই যাতে আমি আপনার সাথে দেখা করি এমনটাই অনুরোধ করেছিলেন তিনি। তাই শহরে ফিরেই আমি সরাসরি আপনার সাথে দেখা করতে চলে এসেছি। আপনি যদি চান আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।"

নীলাদ্রীবাবু যেন কিছুটা সাহস ফিরে পেলেন। তবুও বিচলিত কণ্ঠে ফাদারকে বললেন, "শয়তানকে কীভাবে কাবু করা যেতে পারে? সে তো অদৃশ্য! তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। সে তো অধরা। তাকে ছুঁতে পারা যাবে না। কিন্তু তার বিরুদ্ধাচারণ যে করবে তাকেই গ্রাস করবে মৃত্যু। তাই আমার ধারণা সে আপনারও ক্ষতি করতে পারে।"

ফাদার জর্জ বললেন, "আমাদের পেশায় একমাত্র সত্য হলেন জেসাস ক্রাইস্ট। শয়তানি ক্ষমতা যতই জোরালো হোক না কেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের কাছে তাকে ম্লান হতেই হয়। যবে থেকে ফাদার হয়েছি, তবে থেকেই নিজেকে নিয়ে ভাবা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। এখন আপনার মেয়েকে নিয়ে ভাবছি। আমাকে আপনার মেয়ের কাছে নিয়ে চলুন। আমি ওকে একবার দেখতে চাই।"

নীলাদ্রীবাবু ফাদারকে মৈথিলীর কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁদেরকে দেখে বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মৈথিলী। কিছুক্ষণ দেখবার পর আবার পুতুল খেলায় মনোনিবেশ করল সে। নীলাদ্রীবাবু এবং ফাদার জর্জ আবার ড্রইংরুমে গিয়ে বসলেন। তিনি নীলাদ্রিবাবুর কাছে এই পুরো বিষয়টি সম্পর্কে শুরু থেকে জানতে চাইলেন। তিনিও ফাদারের কাছে পুরো ঘটনাটি খুলে বললেন। ফাদার সম্পূর্ণ ঘটনাটি শুনলেন। তারপর তিনি নীলাদ্রিবাবুকে প্রশ্ন করলেন,

"আপনি কি নিশ্চিত, গত রাতে যে কালো ছায়াটি আপনার সাথে কথা বলতে এসেছিল, সেটি আপনার স্ত্রীইই ছিলেন?"

"হ্যাঁ। আমি অনিন্দিতার কণ্ঠস্বর চিনি। এছাড়া সে যে কথাগুলি আমাকে গতরাতে বলেছে তা অনিন্দিতা ছাড়া আর কারোর জানার কথাও নয়।"

তৎক্ষণাৎ ফাদার জর্জ বলে উঠলেন, "গতকাল রাতে আপনার সাথে যিনি কথা বলেছেন তিনি আপনার স্ত্রী অনিন্দিতা নন। আপনি তো আমাকে একটু আগেই বললেন আপনার স্ত্রী গর্ভাবস্থায় আত্মহত্যা করে মারা গেছিলেন। আর যেহেতু তিনি শয়তানের উপাসনা করেছিলেন তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা ইচ্ছাকৃতভাবে এই বাড়িতে থাকতে পারে না। শয়তান যা চায় তাই-ই তাকে দিয়ে করাতে পারে। শয়তানই তাঁকে ছায়া মানব বানিয়ে রেখেছিল এতগুলো বছর ধরে। শয়তানের ইচ্ছেতেই তিনি এই বাড়িতে এত বছর ছায়া হয়ে ছিলেন। তিনি এখন আর আপনার স্ত্রী বা মৈথিলীর মায়ের রূপে নেই। তিনি কেবল শয়তানের ছায়া মাত্র। তিনি নিজে এখন কোনো কাজকে পরিচালনা করতে পারবেন না। একমাত্র শয়তান তাকে যা বলবে তিনি তাইই করতে বাধ্য। শয়তানের ইচ্ছেতেই তিনি আপনার সাথে কথা বলেছিলেন। তাঁর বলা কথাগুলি বাস্তব নাকি মিথ্যা এটা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। তবে তিনি যে শয়তানের ছায়া ছাড়া আর কিছুই নন এটি নিশ্চিত। তিনি যে কথাগুলি আপনাকে বলেছিলেন তা শয়তানের লাভের জন্যই বলেছিলেন।"

নীলাদ্রীবাবু ফাদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা ফাদার জর্জ, এর হাত থেকে মুক্তির কি কোনো উপায় জানা আছে আপনার? এই বাড়িতে কোনো নারী প্রবেশ করলেই মৈথিলী কেন অসুস্থ হয়ে পড়ে? নারীর এই বাড়িতে প্রবেশের সাথে মৈথিলীর অস্বাভাবিকতার সম্পর্কটা কী?"

"দেখুন মিস্টার নীলাদ্রি, আমি এই বিষয়টি সঠিকভাবে জানি না। তবে আমার যা মনে হয় কোনো নারী এই বাড়িতে প্রবেশ করলে শয়তানের ভ্রূণ মৈথিলীর গর্ভের থেকে তার গর্ভে স্থানান্তরিত হতে চায়। তাই হয়তো মৈথিলী অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে। মৈথিলীর গর্ভের আকার সন্তান ধারণের জন্য অনেকটাই ছোট। কোনো উপায় না পেয়ে শয়তানকে মৈথিলীর গর্ভে জায়গা করে নিতে হয়েছিল। মৈথিলীর জায়গায় আজকে যদি অন্য কোনো নারীর গর্ভে শয়তান থাকত, তাহলে এতদিনে তার বহিঃপ্রকাশ বাইরেও ঘটত। কিন্তু মৈথিলীকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে তার গর্ভে শয়তানের ভ্রূণ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। এমনকী ছ'মাসের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ভ্রূণটা মৈথিলীর শরীর থেকে অন্য শরীরে চলে গেলে শয়তানেরই সুবিধা হত। সে দ্রুত এই পৃথিবীতে আসতে পারবে। মৈথিলীর বয়স না বাড়া পর্যন্ত শয়তানের ভ্রূণ পুরুষ্ট হতে পারবে না। ফলে তার এই পৃথিবীতে আসতে আরো অনেকগুলি বছর অপেক্ষা করতে হবে। সেই জায়গায় যদি কোনো পরিণত নারীর গর্ভে এই ভ্রূণ চলে যেতে পারে, তাহলে এই পৃথিবীতে তার পক্ষে আসা অনেকটাই সহজ হবে।"

তখন নীলাদ্রীবাবু পাল্টা প্রশ্ন করলেন ফাদার জর্জকে, "এর আগে তো এই বাড়িতে অনেক মেয়েরাই এসেছে। তাহলে কেন শয়তানের ভ্রূণ তাদের গর্ভে চলে যায়নি। সেটা যদি হত তাহলে মৈথিলী তো অনেক আগেই এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারত। তাহলে এমনটা হল না কেন?"

তখন ফাদার জর্জ বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন নীলাদ্রীবাবু। তবে বিষয়টা আমিও ঠিক বুঝতে পারছিনা। আপনি আমাকে যে ছায়াগুলির উপস্থিতির কথা বললেন, তার সম্পর্কে আমি আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই। ছায়াগুলি যদি ভাল হত তাহলে কিন্তু তারা নারীদের ভয় দেখাত না। ওই ছায়াটা যদি আপনার স্ত্রীর হত, অন্য কোনো নারী প্রবেশ করলে সে খুশিই হত। ছায়াগুলি হয়তো পুরুষ এবং নারী নির্বিশেষে সকলকেই ভয় দেখিয়েছিল। তবে শুধুমাত্র এই বাড়ি থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু শয়তান তা হতে দেয়নি। সে মৈথিলীর গর্ভকেই বেছে নিয়েছিল। অন্য কারো শরীরে প্রবেশ করার উপায় থাকা সত্ত্বেও সে সেখানে যায়নি।"

নীলাদ্রীবাবু বলে উঠলেন, "আপনি আমাকে খুব দ্বন্দ্বে ফেলে দিলেন ফাদার। এই ছায়াদের সাথে শয়তানের কী সম্পর্ক আমার জানা নেই। এমনকী গতকালের ছায়াটি অনিন্দিতার ছিল না অন্য কারোর তাও আমি জানতে চাই না। যত বেশি এই সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তা করব তত বেশি করে আমি আরো অন্ধকারে চলে যাব। তার চেয়ে বরং আপনি আমাকে বলুন কোন উপায়ে আমি এই সমস্যার হাত থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পেতে পারব? আমি তেমনটাই করব।"

ফাদার বললেন, "শয়তান যাদের হত্যা করবে তারা সবাই তার দাস হবে। দেখুন নীলাদ্রীবাবু, আমার বিশ্বাস আমার ধারণা ভুল নয়। আপনার মেয়ের হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাওয়া নিয়ে আমি যে যুক্তি

দাঁড় করিয়েছি এটাই সঠিক। হ্যাঁ, অবশ্যই এর মধ্যে কিছু প্রশ্ন লুকিয়ে রয়েছে। এর উত্তরগুলো হয়তো খুব শীঘ্রই খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি আজ আসছি। কাল পরশু আবার আসব আপনার সাথে দেখা করতে। তখন হয়তো এই বিষয়ে আমি পরিষ্কার করে বলতে পারব।”

সতেরো

ফাদার জর্জ চলে গেলেন।

বিষণ্ণভাবে নীলাদ্রীবাবু ফাদারের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হয়তো এটাই ফাদারের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা। তিনি যেন জানেন ফাদার আর কখনো এই বাড়িতে আসবেন না। এলেও হয়তো কোনো ছায়ার চেয়ে বেশি মূল্য তার থাকবে না। তিনজন ডাক্তারের মতো তিনিও হয়তো শয়তানের জিঘাংসার বলি হবেন। একদিন আত্মহত্যা করবেন। শয়তানের বিরুদ্ধে যাওয়ার এই মর্মান্তিক পরিণতির পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে। কিন্তু আর কতদিন এই অভিশপ্ত যন্ত্রণা নিয়ে চলতে হবে? আর কত নিষ্পাপ জীবন শয়তানের জিঘাংসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? এসব ভাবতে ভাবতেই আবার বিমর্ষ হয়ে পড়লেন তিনি।

যদিও নীলাদ্রিবাবু বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন যে ফাদার জর্জ আর এই বাড়িতে ফিরে আসবেন না, তবুও একটা ক্ষীণ আশা ছিল তাঁর মনে। কিন্তু চার দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও যখন ফাদার এলেন না তখন আশার আলোটা যেন নিভে গেল। তিনি কোনো কিছু না ভেবেই চার্চের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর দেখা হল অপর এক ফাদারের সাথে। ফাদার গ্রাহামবেল তার হাতে একটি চিঠি দিলেন।

চিঠিটির উপরে ফাদার জর্জ-এর নাম দেখে নীলাদ্রিবাবু বেশ অবাক হলেন। তিনি চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

মিস্টার নীলাদ্রী,

"আপনি শুনলে হয়তো অবাক হবেন, আপনার সাথে দেখা হবার পর আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আমার শরীরের অবস্থা আর তেমন নেই যে আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। আমি হয়তো এই পৃথিবীতে আর মাত্র কয়েকদিনের অতিথি। শয়তানের নজর আমার উপরেও পড়েছে। আপনার ধারণা ভুল ছিলনা যে আমিও এর দ্বারা প্রভাবিত হব। তবে আমি চলে যাবার আগে আমার শেষ কর্তব্যটা পালন করতে চাই। আমি কিছু বই পড়েছি। তার দ্বারা আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পেরেছি যে, আপনার মেয়ের পেটে শয়তানের বীজ রয়েছে। এই বীজকে নষ্ট করতেই হবে। তবে সাধারণ নিয়মে তা করা কখনোই সম্ভব নয়। আমি আপনাকে ফাদার ক্রিস্টোফারের সাথে দেখা করার পরামর্শ দেব। আগামী সপ্তাহে উনি ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় আসছেন। আমি ওঁকে আপনার অবস্থার কথা জানিয়েছি। আপনি যত তাড়াতাড়ি ওঁর সাথে দেখা করবেন ততই ভালো।"

ইতি,

ফাদার জর্জ

চিঠিটা পড়বার পরেই নীলাদ্রীবাবু এক অজ্ঞাত পরিচয় লোককে ফাদার জর্জের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সেই লোকটি তাকে ফাদারের কোনো খোঁজ দিতে পারল না। এরপর তিনি ফাদারের দেওয়া নম্বরে অনেকবার ফোন করার চেষ্টা করলেন তবুও যোগাযোগ করতে পারলেন না। তিনি বুঝলেন এসবই শয়তানেরই চাল। সে সামনে না আসলেও সব কাজই পণ্ড করার ক্ষমতা রাখে।

নীলাদ্রীবাবু ঠিক করলেন যত শীঘ্র সম্ভব উনি ফাদার ক্রিস্টোফারের সাথে কথা বলবেন। সেদিন ভারাক্রান্ত মন নিয়েই একপ্রকার বাড়িতে ফিরলেন তিনি।

বাড়িতে এসে উনি অবাক হয়ে গেলেন। মৈথিলীকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও দেখতে পেলেন না তিনি। ভয়ে তাঁর সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। জলজ্যান্ত মেয়েটা কোথায় গায়েব হয়ে গেল? হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল সামনের আয়নাটার দিকে। সেখানে নীলাদ্রীবাবু দেখলেন কেউ রক্ত দিয়ে লিখে রেখে গেছে যে, "মৈথিলীকে তুই আর বাঁচাতে পারবি না। তার উপর শুধুমাত্র আমার অধিকার আছে। আমি ওকে এই পৃথিবীতে দয়া করে জীবিত রেখেছি। এই পৃথিবীতে যদি কিছু থাকে তাকে আমার অধীনতা স্বীকার করেই থাকতে হবে। তাই আমি চিরকালের জন্য মৈথিলীকে আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি।"

কথাগুলি নীলাদ্রীবাবুকে অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিল। তাঁর দেহের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। চারিপাশ যেন গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। মৈথিলী - মৈথিলী - তুই কোথায়? নীলাদ্রিবাবু চিৎকার করে উঠলেও গলা দিয়ে শুধু গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল। তবে কি আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি? নীলাদ্রিবাবু নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন তিনি হয়তো মৈথিলীকে সারা জীবনের জন্য হারিয়ে ফেললেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে সময় নষ্ট না করে তিনি ফাদার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য তিনি আবার চার্চে গেলেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন ফাদার ক্রিস্টোফারের আসতে এখনও চারদিন সময় লাগবে। খবরটা জানার পর তিনি অসহায়ভাবে ধপ করে মাটিতে বসে পড়লেন। সেসময় এক ফাদার এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে। নীলাদ্রিবাবু তাঁকে আগে দেখেননি। তিনি নীলাদ্রীবাবুকে উঠতে বললেন ও তাঁর কষ্টের কথা জানতে চাইলেন। তিনি সেই ফাদারকে নিজের জীবনের সমস্ত কথা জানালেন। কারণ তখন কোনো মানুষকে বিশ্বাস করা ছাড়া তাঁর কাছে আর কোনো উপায় ছিল না।

লোকটি তাকে বললেন, "আমার নাম ফাদার পিটার। আমি ফাদার ক্রিস্টোফারের শিষ্য। উনি আমাকে অনেক বিষয় সম্পর্কে পরিচয় করিয়েছিলেন একটা সময়ে। আমি ফাদার হবার পর বিদেশ থেকে এই শহরে এসে উঠেছিলাম।"

"এক্সরসিজম শেখানোর জন্য ফাদার ক্রিস্টোফার তখন আমার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। আমাদের গ্রুপে তখন আরও অনেক শিষ্য ছিল। আমরা সকলেই খুব মনোযোগ সহকারে এই প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম। আমাদের গ্রুপেরই একটি ছেলের শরীরে শয়তানি আত্মা ঢুকে যায়। তাকে

বাঁচানো আমাদের কারুর দ্বারাই সম্ভব হয়নি। এই ঘটনার পর ফাদার ক্রিস্টোফার এই কাজ করা বন্ধ করে দেন এবং ঘরবন্দী করে নেন নিজেকে। চোখের সামনে একজনের প্রাণ চলে যাওয়াটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। উনি আমাকে একটি কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কিছু শয়তানি আত্মা এরকমও আছে যাদের এই পৃথিবীতে আহ্বান করতে হয়না। তারা তাদের বংশবিস্তারের জন্য নিজেরাই কোনো শরীরকে খুঁজে নেয়। আমাদের মধ্যে ঐ ছেলেটি নিজেই ছিল শয়তানের উপাসক। সে শয়তানের বিরোধিতা করায় তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়।"

নীলাদ্রীবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "একজন ফাদার হয়ে তিনি কীভাবে শয়তানের উপাসক হতে পারেন?"

জনৈক লোকটি বললেন, "হতে পারে। কারণ সে তখনও ধর্মীয় দীক্ষায় দীক্ষিত হয়নি। ফলে তার শরীরের উপরে শয়তানি শক্তির প্রভাব বিস্তার সহজ ছিল আর সে তার দ্বারাই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। শয়তানি আত্মার শক্তি সত্যিই কোনো সাধারণ শক্তি নয়। আপনার মেয়ে কোথাও যায়নি। তাকে আপনার বাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছে শয়তান। কিন্তু আপনার চোখের আড়ালে রেখেছে। আপনি যে আমার সাথে কথা বলছেন বা আমার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন সে খবরও সে জানে। আপনি ফাদার ক্রিস্টোফারের সাথে দেখা করতে চাইলেও উনি করবেন কিনা আমার তা জানা নেই। কারণ এই ধরনের কাজে জনসাধারণকে সাহায্য করা উনি বহুকাল আগেই ছেড়ে দিয়েছেন। উনি বছরে একবার করে এই চার্চ দর্শনে আসেন। আমাদের সকলের সাথে দেখা করে যান এবং ধর্মীয় বিষয়ে নানান পরামর্শও প্রদান করে থাকেন। তাই আমাকেই আপনাকে সাহায্য করতে হবে দেখছি।"

আঠেরো

“ফাদার আপনি দয়া করে আমার মেয়েটিকে বাঁচান। এটাই আপনার কাছে আমার অন্তিম অনুরোধ।” বললেন নীলাদ্রীবাবু।

ফাদার বললেন, “বেশ, আমি আপনাকে সাহায্য করব। আমার আপনার মেয়ের বিষয়ে ভালোই ধারণা হয়েছে। আমার অনুমানটাই সঠিক। কোনো মেয়ে আপনাদের বাড়িতে প্রবেশের পরেই মৈথিলীর গর্ভের ভ্রূণটা তার গর্ভে স্থানান্তরিত হয়ে যেতে চাইত। ভ্রূণটাকে দেখে বুঝতে না পারা গেলেও তার বয়স ছয় মাসের বেশি হয়ে গেছে। ফলে মৈথিলীর পেটের মধ্যে ভ্রূণটির মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটেছে। তাই সে দ্রুত পৃথিবীতে আসবার জন্যই এই পথের অনুসরণ করতে চেয়েছিল। স্বয়ং শয়তানই চায় তার বাচ্চাটি খুব দ্রুত এই পৃথিবীতে আসুক। সেই-ই ঐ তিনজন ডাক্তারকে হত্যা করেছে। যেহেতু আপনার স্ত্রীর গর্ভে থাকার পর তাকে পুনরায় শরীর বদল করতে হয়েছে তাই তাকে একজন কুমারি মেয়েরই শরীর ধারণ করতে হবে। সেই কারনে মৈথিলী বয়সে এত ছোট হওয়া সত্ত্বেও তার গর্ভে শয়তান জায়গা করে নিতে পেরেছে। মৈথিলী যখন সন্তান জন্মদানের অবস্থায় পৌঁছবে তখন তার শরীরে গর্ভস্থ ভ্রূণটির আকার আরও বড় হয়ে যাবে এবং দেহের বাইরেও তার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হবে। শয়তান টের পেয়েছে আপনার চক্রান্তের কথা। তাই সে মৈথিলীর শরীরটিকে কোনো আলাদা জায়গায় সরিয়ে রেখেছে। যেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারবেবনা। এই অবস্থায় একটাই উপায় রয়েছে মৈথিলীকে বাঁচানোর। আমরা যদি মৈথিলীকে খুঁজে বার করতে পারি তাহলে আমরা আরেকবার সুযোগ পাব ওকে রক্ষা করবার। আমাদের ওর শরীরের ভিতরে থাকা ভ্রূণটিকে মুক্ত করতে হবে। অন্য কোনো নারীর শরীরে বা কোনো বস্তুর মধ্যে স্থানান্তরিত করতে হবে। তবে এই কাজ কখনোই সহজ হবেনা। আমরা যদি একবার এই ভ্রূণটিকে স্থানান্তরিত করতে পারি তাহলে শয়তান পুনরায় আর মৈথিলীর দেহে প্রবেশ করতে পারবে না। চিরকালের জন্য মৈথিলীর দেহকে ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভ্রূণটির মৃত্যু ঘটবে। আপনারা দুজনেই এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন।”

নীলাদ্রীবাবু রাজি হয়ে গেলেন। ফাদার পিটারকে নিয়ে নীলাদ্রিবাবু পৌঁছলেন বাড়িতে। বাড়িটি দেখতেই ফাদার চমকে উঠলেন। ওঁর ধারণা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। বাড়িটিতেই মৈথিলীর উপস্থিতির কথা তিনি স্পষ্ট টের পেলেন। ওঁরা ঘরে ঢুকে দেখলেন গোটা বাড়িটায় কোনো আলো নেই। ফাদার বাড়িতে ঢোকার পথে বেশ কিছু ছায়া দেখতে পেলেন। ছায়াগুলি যে ভয়ঙ্কর সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। ওঁরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই দেখলেন কোনো এক অজ্ঞাত পরিচয় শক্তি তাঁদেরকে বলপূর্বক ঘর থেকে বের করে দিতে চাইছে। ঘরের মধ্যে এক শক্তিশালী শক্তির উপস্থিতি টের পেলেন তাঁরা দুজনেই।

ফাদার পিটার বললেন, "আপনি একটি টর্চ নিন। আর আমাকেও একটি দিন। আমাদের গোটা বাড়িটা খুব ভালোভাবে তল্লাশি করতে হবে। এমন জায়গাতেই শয়তান মৈথিলীকে লুকিয়ে রাখবে যেখানে সহজে আমাদের চোখ যাবে না।"

ওঁরা দুজনে খুঁজতে লাগলেন। মৈথিলীর বেশে শয়তান বহুবার তাঁদের মতি ঘোরানোর চেষ্টা করতে থাকে। বহুবার তাঁদের প্রাণ নেবারও চেষ্টা করতে থাকে। তবুও ফাদার পিটার নীলাদ্রীবাবুকে সাহস বজায় রাখতে বললেন। বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে মৈথিলীকে খুঁজে চললেন।

একটা সময় তাঁরা বাড়ির স্টোররুমে এসে পৌঁছলেন। সেখানে আসতেই তাঁরা দেখলেন পুরোনো একটি আয়নার পিছনে একজনের পা দেখা যাচ্ছে। ওঁরা কাছে যেতেই চমকে উঠলেন। তাঁরা দেখলেন মৈথিলীর দেহটি পড়ে রয়েছে। মৈথিলীর সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত। নীলাদ্রীবাবু মৈথিলীকে দেখামাত্রই তার কাছে যেতে চাইলেন। কিন্তু ফাদার পিটার তাকে বাঁধা দিলেন।

তিনি বললেন, "আপনি যাকে মৈথিলী ভাবছেন, সে আপনার মেয়ে নয়। তার দেহ এখন শয়তানি শক্তির দখলে। আমাদের আগে মৈথিলীর দেহকে শুদ্ধ করতে হবে।"

এরপর ফাদার পিটার তার শিশি থেকে পবিত্র জল নিয়ে মৈথিলীর দেহে নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৈথিলীর দেহটি ভেসে উঠল শূন্যে। ওর শরীরটি এখন হাওয়ায় ভাসছে। মৈথিলীর চোখদুটো এখন তাদের দিকে। ওর শরীর বেশ হালকা। চোখের বর্ণ লাল টকটকে। একরাশ সবুজ বমি ছুঁড়ে দিল সে ওদের দুজনের উদ্দেশ্যে। তারপরেই বিকট সুরে হাসতে লাগল সে। একটি পুরুষ কণ্ঠে ভেসে উঠল কিছু খারাপ কথা, "তোরা হলি শুয়োরের জাত। তোদের ভালো কেউ করবে না। ঈশ্বর কোনোদিন তোদের পাশে ছিল না, ছিলাম শুধু আমি। হাহাহাহাহাহাহাহাহা... আজকেই তোদের শেষ দিন. আজকে আমার হাত থেকে তোদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।"

তারপরেই শয়তান ঘরের পরিবেশকে আরও বেশি ভয়ঙ্কর করে তুলল। ফাদার পিটার নীলাদ্রিবাবুকে বললেন, "এখন শয়তান আপনার মেয়ের শরীরে অবস্থান করছে। আপনি কিন্তু ভাববেন না এই সবকিছু মৈথিলী করছে। ওকে দিয়ে শয়তান এখন এমন অনেক কিছুই করাবে যা আপনার এবং আমার বোঝার একেবারে বাইরে। তবে আপনি বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে যাবেন না। আপনাকে যাই-ই বোঝানোর চেষ্টা করুক না এখন সে - আপনি কিন্তু ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ এখন সে পুরোদমে চেষ্টা চালিয়েই যাবে আপনার ধ্যানকে বশীভূত করার। সেটা আপনি হতে দেবেন না। আপনি আমার সাথে বাইবেলের মন্ত্রগুলি পড়তে থাকবেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি থামবেন না। যতক্ষণ আপনার শরীরে প্রাণ রয়েছে ততক্ষণ আপনি পবিত্র বাইবেলের মন্ত্রগুলিকে পড়তে থাকুন।"

উনিশ

নীলাদ্রীবাবু ফাদারের কথামতো বাইবেলের মন্ত্রগুলি একে একে উচ্চারণ করতে থাকলেন। সেইসঙ্গে পবিত্র জল ছেটাতে থাকলেন মৈথিলীর গায়ে। মৈথিলী যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। কখনো কখনো তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসছিল এক অদ্ভুত তেজ যার দ্বারা যে কোনো মানুষ ঝলসে যেতে পারত। তবুও তাঁরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সহ্য করতে থাকলেন এই সমস্ত অত্যাচার। লক্ষ্য শুধু একটাই, মৈথিলীর প্রাণ ফিরে পাওয়া।

মৈথিলী নানান রকমের গলা করে কথা বলতে থাকল। কখনো নীলাদ্রীবাবুর মনে হল তাঁর মৃত স্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আবার কখনো মনে হল তাঁর মৃত মা দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে। কিন্তু এসবই যে শয়তানের চাল, তার কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন ফাদার তাঁকে। শেষ পর্যন্ত তারস্বরে চিৎকার করল মৈথিলী। তার শরীর এখন হাওয়ায় ভাসছে।

দেখে মনে হচ্ছিল সে শূন্যে শুয়ে রয়েছে। হাত-পা একেবারে নিশ্চল। মুখ দিয়ে শুধু গোঙানির শব্দই ভেসে আসছিল। এরপর আস্তে আস্তে ঘরের পরিবেশটা অনেকটাই শান্ত হয়ে গেল।

ফাদার পিটার বললেন, "এই অবস্থাকে বলা হয় স্থিতি। এই অবস্থায় শয়তানি আত্মা বিশ্রামের অবস্থায় থাকে। এতক্ষণ ধরে পবিত্র শক্তির সাথে লড়াইতে সে ক্লান্ত। আমাদের এইসময়ে থেমে থাকলে চলবে না। আমাদেরকে ধীরে ধীরে মৈথিলীর শরীর থেকে আত্মার মুক্তি ঘটাতে হবে। এর জন্য আমাদের ওর শরীরটিকে নীচে নিয়ে আসতে হবে। মৈথিলী নীচে আসলেই আপনি ওর হাত আর পা বেঁধে দেবেন শক্ত করে। তারপর আমি আরও কিছু মন্ত্রের সাহায্যে ওর শরীর থেকে শয়তানের ভ্রূণটিকে নিক্ষেপ করব সামনে রাখা ঐ আয়নার দিকে। আমি নির্দেশ করা মাত্রই এই আয়নাটিকে আপনি ভেঙে দেবেন। ব্যাস তারপর আমরা চিন্তামুক্ত হতে পারব। তবে তার আগে আমাদেরকে খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। কারণ শয়তান এখন নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকলেও জানবেন সে সজাগ রয়েছে।"

কোনোরকমে মন্ত্রের দ্বারা ফাদার সক্ষম হলেন মৈথিলীকে নীচে নিয়ে আসতে। পূর্বের কথামতো নীলাদ্রীবাবু দড়ির সাহায্যে মৈথিলীর হাত এবং পা শক্ত করে বেঁধে দিলেন। বেঁধে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল শয়তানের আর্ত চিৎকার। কারণ সে জানে এবার তাকে এই মানবশরীর ত্যাগ করতে হবে চিরকালের জন্য। মৈথিলীর শরীরটাকে শয়তান ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। নীলাদ্রীবাবু ভেঙে পড়লেও মনের জোর হারালেন না। তাঁর এখন একটাই লক্ষ্য, যে ভাবেই হোক মৈথিলীর শরীরটাকে শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করা।

মন্ত্র পড়তে লাগলেন ফাদার পিটার। মন্ত্রের ধ্বনির চেয়েও তীব্রতর হয়ে উঠল শয়তানী আর্তকণ্ঠের চিৎকার। কোনো কিছু যেন মৈথিলীর শরীর ভেদ করে বেরিয়ে যেতে চাইছিল। নীলাদ্রীবাবু লক্ষ্য

করলেন কোনো একটি বস্তু সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ল সামনের আয়নাটার দিকে। মৈথিলীর শরীরটা তখন ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল মেঝের উপর।

ফাদার পিটার বললেন, "এবার আর দেরি করলে চলবে না মিস্টার নীলাদ্রী। আপনি তাড়াতাড়ি এই লাল কাপড়টি দিয়ে বেঁধে ফেলুন আয়নাটিকে। আর এই নিন একটা কালো পাথর। এটা দিয়েই আপনাকে ভাঙতে হবে আয়নার কাচটি। মনে রাখবেন এক আঘাতেই যেন ভেঙে যায় কাচ।"

নীলাদ্রীবাবু লাল কাপড়ে বেঁধে ফেললেন আয়নাটিকে। তারপর সজোরে পাথরটিকে বসিয়ে দিলেন আয়নার বুকে। এক আঘাতেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল আয়নার কাচটি। মেঝেতে ছিটকে পড়লেন তিনি এবং জ্ঞান হারালেন।

জ্ঞান ফিরতেই দেখলেন ফাদার পিটারও পড়ে রয়েছেন তার পাশে। তিনিও অচেতন। নীলাদ্রীবাবু তাঁকে ডাকতেই ফাদারের জ্ঞান ফিরল। ওঁরা দেখলেন বেশ কিছু ছায়া এসে জড়ো হয়েছে তাঁদের চোখের সামনে। ঘরের পরিবেশ তখন অনেকটাই স্বাভাবিক। ছায়াগুলি নীলাদ্রীবাবুর চেনা। যারা যারা এই শয়তানি শক্তির কবলে এতদিন আটকে ছিল তারা প্রত্যেকেই শেষবারের মতো দেখা দিয়ে বিদায় নিল। কিন্তু এরপরেই ঘটল মহা বিপর্যয়। হঠাৎ ঘরের মধ্যে আগুন লেগে গেল। এই আগুন তীব্রতার সাথে ছড়িয়ে যেতে লাগল গোটা ঘরে। ফাদার নীলাদ্রীবাবুকে নির্দেশ করলেন মৈথিলীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু নীলাদ্রীবাবু কিছুতেই একা ফিরতে চাইলেন না।

ফাদার পিটার বললেন, "সমস্ত কাজের বিনিময়েই কিছু না কিছু দিতে হয় নীলাদ্রীবাবু। ঈশ্বর হোক বা শয়তান কারুরই এর হাত থেকে নিস্তার নেই। তবে পবিত্র শক্তি আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান কিন্তু অপবিত্র শক্তি আমাদের প্রাণ নিয়ে তবেই শান্ত হন। আমি শয়তানকে শেষ করতে চেয়েছি। তাই সে আমাদের মধ্যে থেকে কারোর প্রাণ নিয়ে তবেই এই পৃথিবী ত্যাগ করবে। আমার বিনীত অনুরোধ আপনি মৈথিলীকে নিয়ে এখুনি এ ঘর ছেড়ে চলে যান। আমার কাজ সুসম্পন্ন করতে পেরেছি। এবার আমি ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করতে চাই। আমি আমার উদ্দেশ্যে সফল হতে পেরেছি। শয়তানের হিংসার লোলুপতা থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করতে পেরেছি। ঈশ্বরের পরম অনুকম্পা ছাড়া একাজ সম্ভব ছিল না।"

ঘরের মধ্যে আগুনের প্রবল উপস্থিতি আর ধোঁয়া আবহাওয়াকে ক্রমশ বিষাক্ত করে তুলছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। তাহলে সর্বগ্রাসী আগুনে ঝলসে মরতে হবে ওদের সকলকেই। নীলাদ্রীবাবু চোখের জল মুছে মৈথিলীকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর তীব্র গতিতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একেবারে বাড়ির বাইরে চলে এলেন তিনি। পেছন ফিরে দেখলেন বাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিমেষের মধ্যে সেই ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল গোটা বাড়িটা।

কিছুক্ষণ পড়ে মৈথিলীর জ্ঞান ফিরে এল। বাবাকে দেখেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

নীলাদ্রীবাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ প্রার্থনাটি জানিয়ে এক ফোঁটা চোখের জল মাটিতে ফেললেন। এখন মৈথিলী নিরাপদ। আর কোনোদিন সেই শয়তানী শক্তি তার

ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না। তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

পরিশিষ্ট

বুকের মধ্যে জমাট বাঁধা ভয়টা আর অনুভব করতে পারলেন না নীলাদ্রীবাবু। আকাশে আবার নতুন সূর্য উঠল। জয় হল শুভ শক্তির। তবুও কোথাও যেন ডঙ্কা বাজিয়ে বলে গেল কেউ,

"সে আছে। সে আজও আছে। তাকে দেখা যায়না। কিন্তু অনুভব করলেই সে আছে। ভয় হয়ে বেঁচে আছে সে প্রতিটি অন্তরেই। শুভ শক্তির অস্তিত্ব যতদিন থাকবে তার পাশাপাশি থাকবে অশুভ শক্তিও। সেও ঘুমিয়ে থাকবে এই মহাবিশ্বের অলিন্দেই।

যখনই কেউ তাকে ডাকবে, সে আবার আসবে, আসবেই।"

Table of Contents

Title Page	1
Copyright Page	2
Dedication Page	3
লেখিকা পরিচিতি	4
ভূমিকা	5
এক	6
দুই	8
তিন	10
চার	13
পাঁচ	16
ছয়	18
সাত	20
আট	23
নয়	26
দশ	29
এগারো	32
বারো	34
তেরো	39
চোদ্দ	44
পনেরো	49
ষোলো	52
সতেরো	56
আঠেরো	59
উনিশ	61
পরিশিষ্ট	64